দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

নিঃশব্দ ক্লাসরুম ফেলে
অনলাইন অ্যাপসে মজে
পড়ুয়ারা — পৃঃ ২৪

পলাশীতে সিরাজের পরাজয়ে
স্বস্তি পেয়েছিল বাঙ্গলা
— পৃঃ ৩৫

৭৪ বর্ষ, ২২ সংখ্যা।। ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।। ২৪ মাঘ- ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

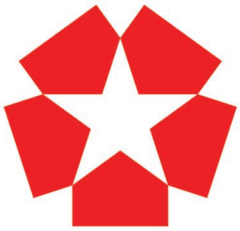

CENTURYPLY®

CENTURYPLY®

CENTURYLAMINATES®

CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM®

CENTURYMDF®

CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ২২ সংখ্যা, ২৪ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

৭ ফেব্রুয়ারি - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'পদ্ম কাঁটায়' বিদ্ধ বঙ্গ আর অভিষেকের 'লম্বা ছায়ায়' ত্রস্ত তৃণমূল
□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

আর এস এস! তবে তো খিস্তি দেওয়াই যায়!
□ সুন্দর মৌলিক □ ৭

কোভিডকে সঙ্গে নিয়েই বাঁচার পথনির্দেশ
□ ডাঃ দেবী শেঠী □ ৮

লোভের বশে তিনি মুসলমান, তাই হিন্দুবিদ্বেষী
□ বিশ্বামিত্র □ ১০

স্বাধীনতাপূর্ব বাঙ্গালি চাষির বাস্তব অবস্থা □ দীপ্তাস্য যশ □ ১১

সংবিধানে দেশের মাটির গন্ধ থাকা দরকার
□ দুর্গাপদ ঘোষ □ ১৩

উপাসনা স্থল আইন ১৯৯১ প্রত্যাহার করা হোক
□ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ১৭

আর নয় গুগল-জুম, ফিরিয়ে দাও ক্লাসরুম
□ অনামিকা দে □ ২৩

নিঃশব্দ ক্লাসরুম ফেলে অনলাইন অ্যাপসে মজে পড়ুয়ারা
□ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ২৪

করোনাকে সামনে রেখে বেসরকারি হাসপাতালগুলি রক্তচোষার ভূমিকায় □ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ২৬

রাজগিরের গুহা রহস্য ও সিদ্ধনাথ শিব
□ দেবাশিস চৌধুরী □ ৩১

খণ্ডিত বঙ্গে থাকতে চাননি উল্লাসকর দত্ত
□ জহরলাল পাল □ ৩৩

পলাশীতে সিরাজের পরাজয়ে স্বস্তি পেয়েছিল বাঙ্গলা
□ বিনয়ভূষণ দাশ □ ৩৫

স্বাধীনতা আন্দোলনে ত্রিপুরার অবদান □ পান্নালাল রায় □ ৪৩

নেতাজী জন্মদিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস ও ইন্ডিয়া গেটের ফাঁকফোকর □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৪৫

ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন সুমন □ সুষমা ভট্টাচার্য □ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ
সমাচার : ২৯-৩০ □ খেলার জগৎ : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১
□ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮ □ রাশিফল : ৪৯ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
১৪ ফেব্রুয়ারি
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৪ ফেব্রুয়ারি
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

‘ভ্যালেন্টাইনস ডে’ ভারতীয় নয়

১৪ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে পাশ্চাত্যে ভালোবাসার দিন হিসেবে মানা হয়। গত কয়েক দশক ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বছরের একটি দিনকে ভালোবাসার দিন হিসেবে মানার হুজুগ আমাদের দেশেও বাড়ছে। কিন্তু ভালোবাসাকে বছরের একটি মাত্র দিনে আটকে রাখা ভারতীয় পরম্পরার সঙ্গে কতটা মানানসই? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায়। লিখবেন স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী, সুকল্প চৌধুরী প্রমুখ।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

With Best Compliments from -

A Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

করোনা মহামারীতে লাভবান কাহারা ?

মহামারী করোনাতে সারা বিশ্ব বিপর্যস্ত। এই মহা দুর্দিনে মানুষের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা বোধহয় আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হইতেছে। সংক্রমণের প্রথম ধাক্কায় রাজ্য সরকার একেবারে দিশাহারা অবস্থায় পড়িয়াছিল। জেলায় জেলায় একাধিক সুপার স্পোশ্যালিটি হসপিটাল নামের নীল-সাদা বাড়িগুলি শোভাবর্ধন করিলেও তাহাতে চিকিৎসা পরিষেবা কিছুমাত্র নাই। সেই সময় সমস্যা হইতে মুখ লুকাইবার জন্য অনবরত কেন্দ্র সরকারের প্রতি দোষারোপ চলিয়াছে। ভোটব্যাঙ্কের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় স্বাস্থ্যবিধি কার্যকর করিবার কোনো উদ্যোগই ছিল না। ফলে সংক্রমণ চরম আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহার সুযোগ লইয়া বেসরকারি চিকিৎসা সংস্থাগুলি মানুষের রক্ত চুষিতে আরম্ভ করে। সাধারণ মানুষের শরীরের রক্ত জল করা টাকা আত্মসাৎ করিবার নানাবিধ পন্থা তাহারা অবলম্বন করে। স্বাস্থ্য সেবার নামে তাহারা এক প্রকার প্রতারণার ব্যবসা খুলিয়া বসে। এই প্রতারণার ব্যবসায় রাজ্যের কোথাও কোথাও গড়িয়া উঠিয়াছে মেডিক্যাল হাব। রাজ্যে দুই হাজারেরও বেশি বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। করোনা মহামারীর সুযোগ লইয়া ইহারা রোগীর পরিবার পরিজনদের কাছে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ দাবি করিয়া বসিয়াছে। কলকাতার আনন্দপুরের কোনো একটি বেসরকারি হাসপাতাল ১০ দিনে ৯৭ হাজার টাকা দাবি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ। শুধু তাহা নহে, মৃতদেহ সৎকার করিবার জন্য ৭ হইতে ১০ হাজার টাকা দাবি করা হইয়াছে। কোথাও কোথাও ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত লওয়া হইয়াছে। এক হাসপাতাল হইতে অন্য হাসপাতালে যাইবার অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া ১০ হাজার টাকাও দাবি করা হইয়াছে। ইহারই মধ্যে ঔষধ, পিপিই কিট, স্যানিটাইজার ও মাস্কের কালোবাজারিও শুরু করিয়াছিল অসাধু ব্যবসায়ীরা। দালালরাজ পূর্ব হইতে কায়েম রহিয়াছে। দালাল না ধরিলে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যাইবে না। করোনা মহামারীর এই ঘোর দুর্দিনে রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হইয়াছে। ভিআইপি বা উচ্চবিত্তরা বিশেষ সুবিধাযুক্ত হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করিয়াছেন আর গরিব ও সাধারণ মানুষকে পথে পড়িয়া জীবন হারাইতে হইয়াছে।

করোনাকালে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থাও শোচনীয়। প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল নূতন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ সৌধটি একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। করোনাকালে বিশ্বের ১৬০ টিরও বেশি দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। ইহার ফলে ১০০ কোটিরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। করোনা সংক্রমণের হার কম হইতেই আইসিএমআর, ইউনিসেফ, হু এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি খুলিয়া দিবার কথা বলিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বক্তব্য, পরিস্থিতি অনুকূল হইলেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হইবে। শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষানুরাগীদের বক্তব্য হইল রাজ্যে শপিং মল, হাটবাজার, বিনোদন কেন্দ্র সব যখন খোলা রহিয়াছে, তখন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলিতে দোষ কোথায়? অনলাইন ক্লাসের কথা বলা হইলেও সরকারি বিদ্যালয়ে তাহা নামমাত্র চলিতেছে। অনলাইন ব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে বেশি। রাজ্য সরকার অনলাইন শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে পারে নাই। উচ্চশিক্ষার মধ্যে কারিগরি শিক্ষার অবস্থা আরও শোচনীয়। বহু ছাত্র-ছাত্রী এই শিক্ষাকে পেশা হিসাবে বাছিয়া লইয়াছে। বিভিন্ন কলেজ হইতে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা যেইভাবে বাড়িয়াছে সেইভাবে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বৃদ্ধি হয় নাই। করোনা আবহে অনলাইন ব্যবস্থায় হাতে-কলমে শিক্ষা বন্ধ হওয়ায় এই ক্ষেত্রেও মারাত্মক বিপর্যয় নামিয়া আসিয়াছে। করোনা আবহের সুযোগ লইয়া বিভিন্ন পেশাদারি অ্যাপস জাঁকিয়ে ব্যবসা শুরু করিয়াছে। উচ্চবিত্তের অভিভাবকরা ইহার খরচ চালাইতে পারিলেও নিম্নবিত্ত বা গরিব অভিভাবকদের ইহা সাধ্যের বাহিরে। বিশষজ্ঞরা বলিতেছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাগুলি খুলিলেই বোঝা যাইবে শিক্ষা ব্যবস্থার দশা কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে।

সুভাষিতম্

আলস্যং হি মনুষ্যাণাং শরীরস্থো মহান্ রিপুঃ।
নাস্ত্যদ্যমসমো বন্ধুঃ যৎ কৃত্ব নাবসীদতি।।

মানুষের শরীরের আলস্যই হলো বড়ো শত্রু , আর উদ্যমের সমান বন্ধু নাই। যার আশ্রয়ে কোনোদিন কোনো দুঃখ হয় না।

‘পদ্ম কাঁটায়’ বিদ্ধ বঙ্গ আর অভিষেকের ‘লম্বা ছায়ায়’ ত্রস্ত তৃণমূল

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

অভিযোগ : ১ বিভাজনের রাজনীতি করে বিজেপি। ২ অনেক দেরি করে সম্মান দিয়েছে বিজেপি। তাই পদ্ম সম্মান আর লাগবে না। পদ্ম সম্মান প্রত্যাখ্যান করে ঠারে ঠোরে এমনটাই জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের তিন জন। কংগ্রেস আমলে অনেক বাম ও বিজেপি মনোভাবাপন্ন মানুষ পদ্ম সম্মান গ্রহণ আর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় আর অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়রা কিংবদন্তী শিল্পী। শিল্পীদের মধ্যে ঠিকানা পাওয়া ঈশ্বরের অসাধ্য।

বামপন্থীরা এখন অপ্রাসঙ্গিক। সিপিএম পলিটব্যুরোর প্রাক্তন সদস্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পদ্মভূষণ গ্রহণ করেনি। কেন করেননি তিনি জানাতে আগ্রহী নন। তবে পদ্ম তালিকায় তাঁর নাম উঠল কী করে তা নিয়ে একটা সংশয় থেকে যাচ্ছে। সিপিএম একটা অহেতুক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছে। সিপিএম নেতাদের অফুরন্ত অবসর। তাই ক্রিজের বাইরে গিয়ে খেলার চেষ্টা করছেন।

বুদ্ধদেববাবু আজীবন আদর্শবাদী নিষ্ঠানির্ভর মানুষ। আমি তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। তিনি ‘আনকম্প্রোমাইজিং’ ‘অবস্টিনেট’ যাকে বলে একরোখা। ‘আনপ্রেডিকটেবল’ও বটে। তিনি কী করবেন বা করতে পারেন আগে থেকে ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। অনেকে বলে ‘লুজ ক্যানন’। এমন কামান যা যে কোনো দিকে গোলা দাগতে পারে। নিজের দিকেও। ঠিক এই জন্য একসময় তিনি দলে কোণঠাসা হয়ে পদত্যাগ করেন। পরে সাফ সুতরো করে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। সরকার চালাতে তাঁর ‘ডু ইট নাও’ স্লোগান এখন প্রাসঙ্গিক বলে আমার ধারণা।

বুদ্ধদেববাবু বা জ্যোতি বসু আগমার্কা সিপিএম নন। তাঁরা ঢিলেঢালা খোলা মনের মানুষ। আমি তাঁদের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট বলেই জানি। তা নিয়ে ভিন্ন মত থাকতে পারে। বামপন্থী বুদ্ধদেববাবুকে আমি দেখেছি কট্টর হিন্দুত্ববাদী উপ-প্রধানমন্ত্রী আর বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি লালকৃষ্ণ আদবানির সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে। যেমন দেখেছি জ্যোতিবাবুকে কেন্দ্রে বিরুদ্ধ সরকারের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে রাজ্যের উন্নয়নে চেষ্টা করতে।

জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রী হওয়া আর ভারত রত্ন সম্মান পাওয়ার দুটো সুযোগই জল ঢেলে দেয় তাঁর দল সিপিএম। দেশের শীর্ষ দুই সম্মান হারিয়েও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দলের সঙ্গেই ছিলেন জ্যোতি বসু। আমার মনে হয় বুদ্ধদেববাবুর পদ্মভূষণ পাওয়ার ব্যাপারেও যথারীতি ‘ব্যাগড়া’ দিয়েছে তাঁর দল। আর দলকে বাঁচাতে বুদ্ধদেববাবু ‘আগে আর পরের’ একটা গোলমেলে হিসাব দিচ্ছেন আর বলছেন ‘যখনই হোক প্রত্যাখ্যান করতাম’।

> **মমতা জানিয়েছেন দল চলবে দলের দপ্তর থেকে। অথচ দপ্তর আই প্যাকের নিয়ন্ত্রণে। মমতা ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছেন।**

বুদ্ধদেববাবুকে পদ্ম পুরস্কার দিয়ে মমতাকে খোঁচা দেওয়া মুশকিল। কারণ দুজনের রাজনৈতিক ধাত আলাদা। এখন তৃণমূলের পালে বাঘ পড়েছে। বাঘের নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার লম্বা ছায়া ক্রমশ বাড়ছে। মমতা বাদে তিনি দলের সবাইকে আঁচড় কামড় দিচ্ছেন। মৃদু গর্জনও করছেন। আর তাতেই ত্রস্ত ‘শাবক’ কুল। আই প্যাকের ব্যবস্থাপনায় দলের খোলনলচে আর সংবিধান পালটাতে চান অভিষেক। ২০২৬ পর্যন্ত এমনটাই চলবে।

মমতা জানিয়েছেন দল চলবে দলের দপ্তর থেকে। অথচ দপ্তর আই প্যাকের নিয়ন্ত্রণে। মমতা ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছেন। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি দলের সাংগঠনিক নির্বাচন। অভিষেকের ‘অভিষেক’ নিশ্চিত করতে আপাতত রাশ ধরেছেন মমতা।

অভিষেকের বিরুদ্ধে সব সমালোচনা ভোঁতা করে দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। তাই দিল্লি আর রাজ্য মিলিয়ে ৪ নেতাকে অভিযোগের নতুন ড্রপ বক্স হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে দু’জন আবার অভিষেক ক্যাম্প বলেই অনেকের ধারণা। ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চের মধ্যে জানা যাবে কাকে আর কীসে বিশ্বাস মমতার? বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। সবাই জানেন আগামীতে মমতার বদলি মুখ নতুন ‘জাতীয় কার্যকরী সভাপতি’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই মমতা আর অভিষেকের পদে কোনো নির্বাচন নেই। ২০ জন কার্যকরী সদস্যের মধ্যে ১০ জন মমতার নির্বাচিত। বাকি ৯ আসনে লড়াই। বাঘের পেটে কারা যাবে তাই নিয়েই কেবল চিন্তা তৃণমূলে। কারাই-বা দলের নতুন মুখ? বাকি সব সেটিং করা রয়েছে। □

আর এস এস! তবে তো খিস্তি দেওয়াই যায়!

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

আপনারা এই প্রশ্নটা করতেই পারেন যে এই চিঠি আপনাদের কেন? সত্যিই কোনও উপায় নেই বলে আপনাদের উদ্দেশেই লিখলাম। আসলে যাঁকে এগুলো বলা দরকার তাঁর সঙ্গে মুখ লাগানোর রুচি নেই আমার। তাই চিঠি লেখারও ইচ্ছা নেই।

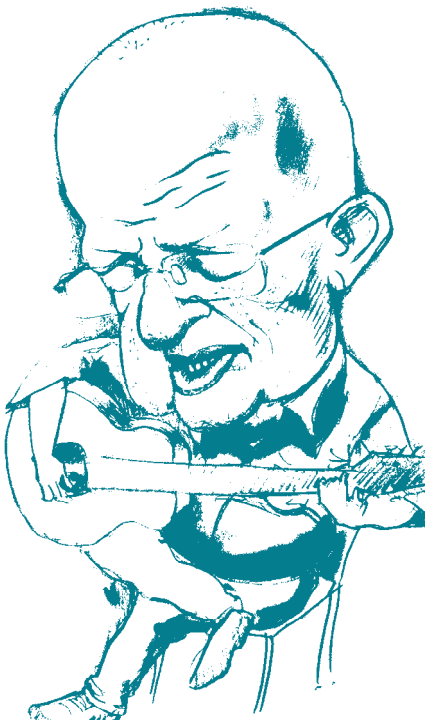

আপনারা অনেকেই শুনেছেন 'কবির' সুমনের ফোনের বক্তব্য। সরি, বক্তব্য নয় খিস্তি (ওগুলোকে গালাগাল বললে বিষয়টা লঘু হয়ে যায়)। ব্রাহ্মণপুত্র সুমন প্রেমে পড়ে বারবার ধর্ম বদলেছেন। আমরা তাঁকে খিস্তি দিইনি। ভোগের স্বার্থে তিনি বাপঠাকুর্দার ধর্মকে বারবার খিস্তি করলেও আমরা পালটা খিস্তি করিনি। গানের নামে সনাতন সংস্কৃতিকে গাল দিলেও আমরা কিছু বলিনি। বরং, মন দিয়ে গান শুনেছি গালওয়ালার। বাহ্, বাহ্ করে অনেক হাততালি দিয়েছি। 'তোমাকে চাই' বলে গুনগুন করেছি। আজ তারই এই পরিণতি। তিনি যথেচ্ছ গাল দিতে পারেন। বলতে পারেন, সে গাল টিভিতে সম্প্রচার করা যেতে পারে। বলতে পারেন, আবার এমন আচরণ করবেন।

একজন সাংবাদিককে গাল দেওয়া উচিত কি না, দিলেও তার সীমা কতটা থাকা উচিত তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি আর তার মধ্যে ঢুকতে চাইছি না। অনেক হয়েছে। আমি একটা কথা খালি বলতে চাই, যে চ্যানেলের সাংবাদিককে খিস্তি দিলেন সুমন সেটির সঙ্গে আরএসএস-এর যোগাযোগের অভিযোগও তুলেছেন। সেই অভিযোগের কোনও সারবত্তা না থাকায় তাকে আমি খুব একটা পাত্তাও দিচ্ছি না। কিন্তু আরএসএস যোগ রয়েছে এই অভিযোগ তুলে কি খিস্তি দেওয়া যায়!

আচ্ছা সুমন কি মনে করেন যে হিন্দুত্ববাদী, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা খিস্তি জানেন না। তাঁরা কি কখনও শোনেননি, না কি চাইলে বলতে পারেন না। এটি ঠিক যে বলতে পারেন না। মগজে থাকলেও আত্মায় নেই, তাই মুখেও নেই। তাই বলে এমন ভাবার কারণ নেই যে স্বয়ংসেবকরা তথা সঙ্ঘের ঘনিষ্ঠ সংগঠনের কর্মীরা শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করেন বলে কিছুই জানেন না। কিন্তু সুমনদের সৌভাগ্য যে, তাঁরা যে মুখে শ্লোক উচ্চারণ করেন সেই মুখকেই ওঁর মতো নর্দমা বানান না। রুচি, শিক্ষা, সংস্কৃতি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই সুমন আপনি বেঁচে গিয়েছেন।

শুধু সুমন নন, তাঁর মতো শহুরে নকশাল থেকে অশালীন তৃণমূল, ব্রাত্য বামপন্থী থেকে উবে যাওয়া কংগ্রেসের লোকজন অনেক সময়েই আরএসএস বলেই খিস্তি দিতে শুরু করেন। না, আমি বলছি না যে তার জবাব দিতে হবে। বরং, বলতে চাই যে, জবাব দিতেই হবে না। আসলে মনে রাখতে হবে ওঁরা ভয় পাচ্ছে। সবাই যখন অস্তিত্বের সংকটে তখন প্রায় একশো বছরে হতে চলা একটি সংগঠন দিনে দিনে আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে, আরও সুনাগরিক, রাষ্ট্রনেতা তৈরি করে চলেছে তখন হিংসার পাশাপাশি ভয়ও বাড়ছে। এটাই স্বাভাবিক। তাই সুমনদের মুখে এই ভাষা। বুঝতে পেরেছেন সময় কমছে।

আরও একটা কথা বলতেই হবে। খিস্তির উত্তর যেমন খিস্তি হতে পারে না তেমন এটাও ভাবার কোনও কারণ নেই যে কোনও জবাবই দেওয়া যাবে না। এই ধরনের অমানুষদের শিল্প সৃষ্টি নিয়ে নাচানাচি করাটা বন্ধ করা দরকার। যিনি ত্রিশূলে কন্ডোম পরাতে চান, যিনি গানের আড়ালে গাল ভাজেন তাঁদের বয়কট করাই শ্রেয়। মনে রাখতে হবে, ভারতের মতো এক মহান সংস্কৃতির দেশে এঁদের মূল্য নেই বললেই চলে। এরা ক্ষণস্থায়ী। অনেক চিরকালীন সম্পদের আধার এই ভারত এঁদের নিয়ে ভাববেই-বা কেন? □

অতিথি কলম

ডাঃ দেবী শেঠী

‘কোভিডকে’ সঙ্গে নিয়েই বাঁচার পথনির্দেশ

আমরা যদি প্রতিনিয়ত গভীর মনোনিবেশ দিয়ে কেবলমাত্র কোভিড পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ঘোষণা করে একটা আতঙ্কের বাতাবরণ সৃষ্টি করি তাহলে ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত মানুষজন তাদের কারবার চালু করতে দ্বিধা করবে। ফলে কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা তৈরি হবে।

বিদেশে একটি বহুল প্রচলিত বাক্য শুনতাম ‘শুঁয়াপোকা যখন বলবে আমার খেলা শেষ হলো, বুঝবে আকাশে প্রজাপতির উড়ান শুরু হলো।’ কথাটি অর্থবহ। বিধ্বংসী কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের মরণ কামড়ের পর তৃতীয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে আমরা ব্যাঙ্গালোর শহরের হাসপাতালগুলিতে এক হাজারেরও বেশি রোগীর শয্যাকে করোনার আইসিইউ শয্যায় রূপান্তরিত করে গুরুতর আক্রান্ত রোগীর উপযুক্ত করেছিলাম। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগত তথ্য অনুযায়ী অনেক সময়েই পজেটিভিটি রেট ৫০ শতাংশ অতিক্রম করলেও আমাদের মাত্র ২৯টি আইসিইউ শয্যা ভর্তি হয়েছে। আমি জানি দেশের বহু প্রদেশেই অবস্থাটা আমাদেরই মতো। গুরুতর রোগীর অক্সিজেন সুবিধে-সহ অধিকাংশ শয্যা খালিই রয়েছে।

মাথায় রাখা দরকার, সারা দেশের সমস্ত অঞ্চলেই এখন কোভিড পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকায় আমরা এই রোগটি যে মহামারী সেটা জানতে পারছি। যদি কেবল কয়েকটি রাজ্যে এই সুবিধে থাকত তাহলে আমরা এটিকে নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ একটি রোগ বলে ছেড়ে দিতাম। এর কারণ এখন এই রোগের লক্ষণগুলি খুবই মামুলি, তাই লোকে পরীক্ষা না করেই ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের কর্মোদ্যোগী সরকার, সংবেদনশীল ডাক্তারবাবু, নার্স ও অন্যান্য সাহায্যকারী কর্মীরা চিকিৎসা শাস্ত্রের অসামান্য অবদান কোভিড টিকার দ্বারা বলীয়ান হয়ে এই মহামারীর গতিপ্রকৃতিকেই বদলে দিয়েছেন। মনে পড়ে এই মহামারী প্রারম্ভে আমরা পিপিই আর এন-৯৫ মাস্কের নাম শুনিনি। আজ আমরা এইসব জিনিস বিদেশে রপ্তানি করছি। এটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে ১৫০ কোটিরও বেশি টিকা আমাদের দেশে দ্রুততম সময়ে প্রয়োগ করা হয়েছে।

আজ দেখলে আত্মবিশ্বাসে বুক ভরে ওঠে যে ডাক্তারবাবুরা তাঁদের ‘হেডগিয়ার’ খুলে কেবলমাত্র এন-৯৫ মাস্ক অবলম্বন করে কোভিড আইসিইউ ওয়ার্ডগুলিতে নিঃশঙ্কচিত্তে কাজ করে চলেছেন। রোগীরা কোভিড আক্রান্ত হওয়ার মাত্র ৫ দিনের মধ্যে সেরে উঠে নিজেদের কাজে আবার ফিরে আসছেন। আমাদের কাছে কোভিড এখন আর পাঁচটা রোগেরই মতো তাই আমাদের এর সঙ্গে বসবাস রপ্ত করতেই হবে। এই সূত্রে সরকারের কাছে আমাদের কয়েকটি পরামর্শ বা অনুরোধ আছে।

(১) কোভিড নিজে যেহেতু বদলে গেছে সেই কারণে আমাদেরও কৌশল বদল করতে হবে। আমার বলতে হিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, দেশ হিসেবে আমরা যে সকল কর্মকাণ্ড করতে পেরেছি বিত্তশালী পশ্চিমি দেশগুলি সেই সাফল্য দেখাতে পারেনি। তাই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন চোখ কান বুজে করোনা মিটে গেছে ঘোষণা করে তাঁর দেশবাসীকে মাস্ক খুলে ফেলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে বললেও আমরা তাঁর অনুকরণ করতে পারি না। হ্যাঁ, আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও মাস্ক পরা দুটোই আগের মতো মেনে চলব। আমাদের এখনকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেশের অর্থনীতির পুনর্নির্মাণ ও স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো মহামারীর মোকাবিলার উপযুক্ত করে তোলা।

এখন পাইকারি হারে কোভিডের পরীক্ষা করার আর দরকার নেই। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া বা এইচআইভি নির্ধারণের জন্য যেমন ডাক্তাররা রক্ত পরীক্ষার কথা বলেন কোভিড নির্ধারণের পরীক্ষাও তাঁদের মতামত অনুযায়ী চলবে। কিছু হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের বিশেষ করে আইসিইউ শয্যাগুলির ক্ষেত্রে বাড়তি যত্ন জরুরি। উপসর্গহীন রোগীর বিরাট সংখ্যা জনমনে একটা আতঙ্কের আবহ তৈরি করে। যে ‘স্প্যানিস ফ্লু’র কথা এই সূত্রে বারবার বলা হয়, সেই ফ্লু আজও আছে, শুধু ভোল বদলে বিভিন্ন ঋতুকালীন ফ্লু নাম নিয়েছে। স্প্যানিস ফ্লু-র সময়ে কোনো ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, তাই রোগীদের হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা যখন দ্রুতহারে কমতে লাগল, তখন ধরে নেওয়া হলো মহামারী শেষ হয়ে গেছে। এবং এই নাটকীয়ভাবে রোগ কমে যাওয়ার ফলে জীবন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে গেল।

(২) আর কোনো ‘লকডাউন’ যেন ভবিষ্যতে যখন-তখন জারি না করা হয়। কেবলমাত্র যদি রোগীর ভিড়ে হাসপাতগুলি উপচে পড়ে তখনই সেই কথা ভাবার প্রশ্ন উঠবে। করোনা পরীক্ষার পজিটিভিটির হার কত সেই ভিত্তিতে লকডাউন যেন বিবেচিত না হয়।

(৩) রোগীকে নানাবিধ ওষুধপত্র দিয়ে যে ফল পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যে মহামারীর গতি পালটে দিয়েছিল একটি জিনিস তা হলো টিকা। মনে রাখতে হবে, কোভিডের টিকাটি আসলে

মৃত্যুর বিরুদ্ধে টিকা। ভারতের পক্ষে এখন বিভিন্ন মিউটেশনের উপযোগী টিকা তৈরি এবং ওষুধ উৎপাদনকারী বহু শিল্প সংস্থা তৈরি বিশেষ প্রয়োজন। আমরা যেন ভুলে না যাই কোভিডের প্রথম আক্রমণের সময় পশ্চিমি দেশগুলি কেমন অবলীলায় আমাদের ভেন্টিলেটর ও পিপিই কিট পাঠানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। অথচ ওই সময়েই প্রয়োজন ছিল চরমে।

(৩) শিশুশ্রেণী থেকে উঁচু ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয় এখুনি খুলে দেওয়া দরকার। অবশ্যই সমস্ত নিরাপত্তার শর্ত মেনে। অন লাইন শিক্ষা বেশ কিছুটা রপ্ত হয়ে যাওয়ায় সেটিও চালিয়ে যাওয়া দরকার। এই মর্মে আইজিএনওভি-কে একটি পূর্ণ মাত্রার অনলাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা উচিত। এখানে তরুণ পরিযায়ী শ্রমিক যারা নির্মাণক্ষেত্রে কাজ করছে তাদের জন্য কিছুটা তত্ত্বগত প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষাক্রম চালু করলে ভালো হয়।

(৪) প্রত্যেকটি বড়ো হাসপাতালের শয্যাগুলিকে সেখানকার একটি কেন্দ্রীয় অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করা উচিত।

(৫) প্রত্যেকটি রাজ্যেরই একটি করে মাইক্রোব নিয়ে উপযুক্ত গবেষণাগার থাকা দরকার।

(৬) স্বাস্থ্য বিমার ক্ষেত্রটিতে নতুন নতুন স্টার্ট আপ সংস্থা গড়ে তুলে সীমিত সংখ্যক বিমা সংস্থার আধিপত্য খর্ব করা যেতে পারে। এর ফলে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণীর মানুষ নিজেদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে। ব্যাপক হারে স্বাস্থ্যবিমা চালু হলে প্রিমিয়ামও অনেক কমে আসবে। এই প্রিমিয়ামকে আয়কর ও জিএসটি থেকে মুক্ত করতে হবে।

(৭) সরকারের উপযুক্ত প্রচেষ্টায় দেশে এখন ৬০০-র ওপর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ গড়ে উঠেছে। সরকার চিকিৎসা ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা আসন চালু করতে পারলে চিকিৎসাকর্মীর সংখ্যা অনেক বাড়বে, যেমন ইংল্যান্ডে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস চালু আছে। বড়ো বড়ো হাসপাতালগুলিতে এমডি করার আসনের সংখ্যা নিশ্চয় বাড়াতে হবে।

(৮) যে সমস্ত হাসপাতালে ১০০-র বেশি শয্যা আছে সেখানে তাদের নার্সিং ও প্যারামেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষাক্রম চালু করতে সরকারের তরফে উৎসাহ দেওয়া দরকার। এটা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ হয়েছে যে কোভিডের ক্ষেত্রে নার্সদের ভূমিকা ডাক্তারবাবুদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।

আজকে বিশ্বের প্রতিটি দেশ তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। আর এই প্রচেষ্টায় তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে ভারতীয় ডাক্তার ও নার্সদের নিয়োগ করতে। গরিব ঘরের তরুণীদের যারা নার্সিঙের প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাদের কাছে বিদেশে নার্সের চাকরি নিয়ে বিপুল রোজগারের সুবর্ণ সুযোগ এসেছে।

আমরা শতাব্দীর এক ভয়ংকর মহামারীর সময়কালে চিকিৎসাক্ষেত্রে নিজেদের উৎকর্ষের জন্য লক্ষ প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি। এখন কিন্তু আমাদের যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মহামারীর কারণে কর্মহীন হয়ে পড়েছে বা যাদের সারাজীবনের সঞ্চয় ব্যবসা বন্ধ থাকার কারণে খরচ করে জীবন ধারণ করতে হয়েছিল তাদের সমস্যার নিরসনে বড়োসড়ো চেষ্টা করতে হবে।

মনে রাখা দরকার, আমরা যদি প্রতিনিয়ত গভীর মনোনিবেশ দিয়ে কেবলমাত্র কোভিড পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ঘোষণা করে একটা আতঙ্কের বাতাবরণ সৃষ্টি করি তাহলে ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত মানুষজন তাদের কারবার চালু করতে দ্বিধা করবে। কারবারের বৃদ্ধি করতেও ভয় পাবে। এর ফলে নতুন চাকরি তৈরি হওয়ার রাস্তাও বন্ধ হবে। আর তরুণরা চাকরিবাকরি না পেলে দেশে শান্তি থাকবে না। ভুললে চলবে না ২০২০ সালের ২২ মার্চ প্রধানমন্ত্রী মোদী 'থেমে যাও' বোতাম টিপে জনতা কারফিউ' জারি করেছিলেন। জাতি এক অদেখা শত্রুর সঙ্গে মহারণে লিপ্ত হয়ে আজ বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

আজ আমাদের একান্ত কামনা যে, প্রধানমন্ত্রী 'শুরু কর' বোতামটির সঙ্গে 'খেলা আরম্ভ' বোতামটিও টিপবেন যাতে দীর্ঘকাল ঘরে আবদ্ধ শিশুরা আবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হাসি খেলায় মুখর করে তুলতে পারে। তাদের সেই হাসি দ্রুত সংক্রমিত হয়ে আপামর মানুষের মুখে হাসি ফিরিয়ে দেবে। □

পরলোকে প্রবীণ স্বয়ংসেবক সজল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়ার প্রবীণ স্বয়ংসেবক সজল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৫ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। জন্ম কলকাতার দর্জিপাড়া। ১৮ বছর

বয়সে মানিকতলার তেলকল মাঠ শাখায় স্বয়ংসেবক হন। ১৯৪৪, ১৯৪৫ ও ১৯৪৭ এই তিন বছরে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ সমাপ্ত করেন। দেশ ভাগের সময় থেকে বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার মিথ্যা অভিযোগে ও ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থায় কারাবাসে ছিলেন। হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর এই তিন জেলার বিভাগ কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সঙ্ঘের প্রচারক না হয়েও সারাজীবন প্রচারকের মতো বিভিন্ন স্থানে সঙ্ঘকাজে ভ্রমণ করেছেন। ৯৮ বছর বয়সে হাওড়ার একটি নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন পরিবারের সদস্য এবং সঙ্ঘের অগণিত গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবককে।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা আলিপুরদুয়ার মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্যামাপদ সান্যাল গত ২০ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তাঁর নিবাস নিউটাউন দুর্গাবাড়ি, আলিপুরদুয়ার হলেও ইদানীং কলকাতায় বড়োমেয়ের বাড়িতে থাকতেন। সংসারের দায়দায়িত্ব পালন করে বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রথম আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, একল বিদ্যালয় অভিযান প্রভৃতি সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে তাঁর অবদান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণাদায়ী।

লোভের বশে তিনি মুসলমান, তাই হিন্দুবিদ্বেষী

ভাইরাল অডিয়োটা শোনেননি এমন কেউ নেই। একজন সর্বভারতীয় বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাংবাদিক তিনি নিতান্ত পেশার তাগিতে সেই বিকৃতমনাকে ফোন করেছিলেন। তাঁকে দুটি জাতীয়তাবাদী সংগঠনের নাম করে ছাপার অযোগ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং সর্বাপেক্ষা গর্হিত অপরাধ তিনি ওই সাংবাদিকের মাতৃপরিচয় নিয়ে, যিনি কোনোভাবেই এসবের সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁর বকলমে সমগ্র বাঙ্গালির মাতৃপরিচয় মুখে আনার অযোগ্য ভাষায় উদ্ধার করেন। ভিডিয়োতে ভারতের অন্য ভাষাভাষী হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ সুস্পষ্ট। 'মাওরা হিন্দু' শব্দবন্ধনী প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ বিদ্বেষভাব তিনি ছড়িয়েছেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার খাতিরেও তা রীতিমতো বিপজ্জনক। সঙ্গত কারণেই আমরা সেই লোকটির নাম উল্লেখ করছি না, কারণ তার নামটাও উচ্চারণ করতে ঘৃণাবোধ হয়।

শুধুমাত্র একাধিক বিয়ের লোভে এবং একজন মুসলমান রমণীর পাণিগ্রহণের জন্য তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং তারপরেই হয়ে যান চরম হিন্দু-বিদ্বেষী। কিন্তু এই চরম মৌলবাদী ব্যক্তিটি তাঁর তথাকথিত গায়কের 'ক্যারিশমা' দিয়ে সেকুলারিজমের মুখ হয়ে ওঠেন। সেই মুখোশের আড়ালে তিনি এতকাল হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে এসেছেন। সেকুলারবাদী মিডিয়াও তাঁকে এতকাল 'প্রফেট' বলে প্রচার করে এসেছে। এদের সবার মুখোশটাই হঠাৎ যেন একটানে খসে পড়ল।

যাইহোক, ভাইরাল ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে বিজেপি নেতা তথা কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সজল ঘোষ ওই লোকটির বিরুদ্ধে মুচিপাড়া থানায় এফআইআর দায়ের করেন। দুর্গাপুরের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোড়ুই-ও পৃথক এফআইআর দায়ের করেন। অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্মিলিত প্রতিবাদের মুখে পড়ে তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতেই নাম-কা-ওয়াস্তে একটা অ্যাপলজি

চান বটে, কিন্তু তার মধ্যেও ছিল শ্লেষের সুর, যা করেছি ঠিক করেছি গোছের মনোভাব। এবং অ্যাপলজির শেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নামে জয়ধ্বনি বুঝিয়ে দেয় কিসের খুঁটিটিকে কাজে লাগিয়ে তিনি এসব করার সাহস পাচ্ছেন।

এখন কথা হলো, যে কথাগুলো তিনি বলেছেন, যে ঘৃণা বিদ্বেষ তিনি ছড়িয়েছেন, তাতে সাধারণ মানুষের সামনে এদের মতো লোকের স্বরূপ উন্মোচিত হলেও, কিন্তু তার সঙ্গে এটাও বলা দরকার হরেক কিসিমের কমিউনিস্ট মানে নকশাল, মাওবাদী, গণতান্ত্রিক- অগণতান্ত্রিক নানাপ্রকার ব্যবস্থায় বিশ্বাসীরা, যাদের অনেকেই আজ রাজ্যের শাসক শিবিরে, এদের অনেকেই কিন্তু তার কথার কোনো কোনও প্রতিবাদ করেননি বা করলেও মৃদু প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা মূলত সরব হয়েছেন যে অশ্লীল ভাষায় কথা বলা হয়েছে সেটা নিয়ে। অনেকে আবার সেটুকুও করার প্রয়োজন মনে তো করেছেনই না, উপরন্তু একে সমর্থন করছেন।

কেউ কেউ তো এমন প্রশ্নও তুলছেন, ওই সাংবাদিককে কে কলরেকর্ডের অনুমতি দিল! আসলে কলটি রেকর্ড করায় পেট্রোডলারের মদতপুষ্ট সেকুলারিজমের প্রকৃত চেহারাটি সাধারণ মানুষ দেখতে পেয়েছেন। এই কদর্য চেহারা কিন্তু কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর গত সাড়ে সাত বছরে ভারত তথা বাঙ্গলার মানুষ বারংবার দেখেছেন। একটা সাম্প্রতিকতম উদাহরণ দিই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক মন্ত্রী স্রেফ বিজেপির প্রতীক হওয়ার অপরাধে পদ্মফুল ছিঁড়ে ফেলছেন, কেন শুধু পদ্মই জাতীয় ফুল হবে, গোলাপও সেইসঙ্গে হবে না কেন ইত্যাদি সম্ভবত মদিরাসিক্ত অবস্থায় এমনসব দাবি তুলেছেন। নির্ভেজাল ভাঁড়ামি বাদ দিলে এতে করে তিনি যেমন হিন্দুদের ভাবাবেগকে আঘাত করলেন কারণ ১০৮ পদ্ম ছাড়া কোনো দেবীরই পূজা সুসম্পন্ন হয় না। অন্যদিকে একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিও ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ালেন। বাক্‌স্বাধীনতার অজুহাতে এই ঘৃণা ও বিদ্বেষ শুধু দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করছে না, একই সঙ্গে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে হিংসার সমর্থনে কুযুক্তি তৈরিতে প্ররোচিত করছে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন- পরবর্তী হিংসায় যা দেখা গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নিজের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে রাজ্যের মহামহিম রাজ্যপাল সদাই সচেষ্ট, তিনি সম্প্রতি এরাজ্যের গণতন্ত্র গ্যাস চেম্বারে আছে বলে সঠিক ভাবেই মন্তব্য করেছেন। কিন্তু শুধু রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করবেন আর বাকিরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবেন, তাহলে রাজ্যের গণতন্ত্র কখনোই সুরক্ষিত হতে পারে না।

কোনো বিশেষ সংবাদমাধ্যমকে কারোর পছন্দ না হতেই পারে। কিন্তু সেই সুযোগে নেহাত পেটের দায়ে সাংবাদিকতা করতে আসা কোনো মানুষের বাবা-মাকে উদ্ধার করবেন, এটা মেনে নেওয়া যায় না। সাংবাদিকরা অনেকেই নিজের মতো করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে যে দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল সংবাদমাধ্যমের, তা কোথাও যেন অনুপস্থিত। □

স্বাধীনতাপূর্ব বাঙ্গালি চাষির বাস্তব অবস্থা

দীপ্তাস্য যশ

'বাপু দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাতপুরুষের বাস। স্বর্গীয় কর্তারা যে জমিজমা করে গিয়েছেন তাতে কখনও পরের চাকরি করতে হয়নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথি সেবা চলে, আর পুজোর খরচ কুলোয়; যে সরিষা পাই, তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া যাট সত্তর টাকার বিক্রী হয়। বল কি বাপু, আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরই ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? আর কেইবা সহজে পারে?'

স্বাধীনতার আগে বাঙ্গলার চাষির অবস্থা ঠিক কেমন ছিল তা খুব সহজে বোঝা যায় এই নীলদর্পণ নাটকে। নীলচাষ ও মন্বন্তর 'শিক্ষিত, সভ্য' ব্রিটিশ জাতি ঠিক কীভাবে বাঙ্গলাকে ও বাঙ্গলার চাষিকে লুটে নিয়েছে তাদের দুশো বছর শাসনকালে তা এই দুই সময়ের ঘটনাবলী অনুসরণ করলেই বোঝা যায়। শাসকের সৃষ্ট মন্বন্তরে যত মানুষ এই বাঙ্গলায় মরেছিল তত মানুষ হিটলারের গ্যাসচেম্বারেও মারা যায়নি। অথচ তারপরেও সেই সময়ের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ফ্যাসিস্ট আখ্যা পান না এবং অদ্ভুতভাবে কয়েকজনকে বাদ দিলে আমাদের বেশিরভাগ নেহরুভিয়ান ঐতিহাসিকও এই ঘটনা নিয়ে প্রায় কোনো গবেষণাই করতে রাজি নন।

এই লেখার শুরুতেই নীলদর্পণ নাটকের গোলক চরিত্রের এই যে বয়ান উদ্ধৃত করেছি সেখান থেকেই পরিষ্কার বাঙ্গলার চাষি এবং বাঙ্গলার কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ঠিক কীরকম স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। গ্রামগুলি এই কৃষিনির্ভর অর্থনীতির উপরে ভিত্তি করেই দিনযাপন করত। সেখানে হয়তো অর্থের প্রাচুর্য ছিল না কিন্তু অভাবও প্রকট ছিল না। মানুষের দুইবেলা গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্তটুকু ছিল। কিন্তু নীলচাষ আর তারপরে বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশদের সৃষ্ট মন্বন্তর এই অর্থনীতিকেই ভেঙে দেয়।

ব্রিটিশদের কাছে বাঙ্গলার স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য অস্তমিত হওয়ার পুরো এক শতাব্দী পেরিয়ে গেছে। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের উপর ব্রিটিশদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে আরও কয়েকগুণ। অত্যাচার আর নিপীড়নে নতুন মাত্রা যোগ করে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব। উনিশ শতকে বস্ত্রশিল্পের বিকাশের প্রয়োজনে নীলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষের নীল খুব দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ইউরোপে। ব্রিটিশরা সস্তা এবং উন্নতমানের নীলের চাহিদায় ভারতবর্ষের প্রতি উৎসাহিত হতে থাকে। ইংরেজ-সহ অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরা ভারতবর্ষে এসে চাষিদের ধানের পরিবর্তে নীল চাষে বাধ্য করতে থাকে। তাদের উৎসাহ ও চাহিদায় সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হতো সাধারণ কৃষকদের, কেননা যে জমিতে একবার নীল চাষ করা হয় সেই জমিতে আর কখনো অন্য কিছু উৎপাদন করা যেত না। এর ফলে বাঙ্গলার সুজলা সুফলা জমি পরিণত হয় পতিত জমিতে।

বাঙ্গলার কৃষক তাঁর কঠিন পরিশ্রম, অপরাজেয় মানসিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের জেরে বাঙ্গলাকে মরুভূমিতে পরিণত হতে দেয়নি এবং দেশের শস্যভাণ্ডারকে মজবুত করেছে।

প্রথম দিকে নীল চাষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার লোপ পায় এবং ব্রিটেন থেকে দলে দলে ইংরেজ নীলকররা বাঙ্গলায় আগমন করে ইচ্ছামতো নীলের চাষ শুরু করে। তখন থেকেই কৃষকদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। ফলে ১৮৫৯ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে নীলচাষিরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে নীল চাষ করতে অস্বীকৃতি জানায়। প্রথমদিকে এই আন্দোলন অহিংস ছিল, কিন্তু নীলচাষ না করার কারণে চাষিদের ওপর ভয়ানক নির্যাতন, গ্রেপ্তার শুরু হলে এ আন্দোলন সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হয়। অর্ধ শতাব্দীর অত্যাচারের পরে শুরু হয় নীল বিদ্রোহ। খুব দ্রুত এই বিদ্রোহ সারা বাঙ্গলায় ছড়িয়ে পড়ে।

নীল বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার ১৮৬০ সালে 'নীল কমিশন' গঠন করে। এই কমিশন সরেজমিনে তদন্ত করে চাষিদের অভিযোগ যথার্থ বলে অভিমত দেয়। ফলে সরকার নীলচাষের ওপর একটি আইন পাশ করে। এতে ১৮৬২ সালে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। ১৯০০ সালে নিশ্চিন্তপুরের নীলকুঠি উঠে যাওয়ার মাধ্যমে বাঙ্গলায় সম্পূর্ণভাবে নীলচাষের অবসান ঘটে।

স্বাধীনতাপূর্ব বাঙ্গলায় ব্রিটিশদের কুশাসনের জেরে বাঙ্গলার চাষিদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে পড়ে। তেমনই আরেকটি ঘটনা হলো পঞ্চাশের মন্বন্তর। আনুমানিক ২১ থেকে ৩০ লক্ষ মানুষ অপুষ্টি, বিপুল জনসংখ্যা, স্থানচ্যুতি, অস্বাস্থ্যকর অবস্থা ও স্বাস্থ্য সেবার অভাবের কারণে অনাহার, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগে মারা গেছে। লক্ষ লক্ষ লোক দরিদ্র হয়েছিল কারণ এই

সংকট অর্থনীতির বড়ো অংশকে অভিভূত করেছিল। এবং সামাজিক কাঠামোকে বিপর্যস্ত করেছিল। অথচ এমন না যে ফসলের উৎপাদন কম হয়েছিল। এই সংকট সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশদের সৃষ্ট।

জাপান প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার (তৎকালীন বার্মা) দখল করে নেওয়ার পর তেতাল্লিশের মন্বন্তর শুরু হয়। ওই সময় বার্মা ছিল চাল আমদানির বড়ো উৎস। এই মন্বন্তরে বাঙ্গলাজুড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা যায়। ভারতবর্ষের তৎকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক সেনা ও যুদ্ধে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য বিপুল পরিমাণ খাদ্য মজুত করায় এই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

ব্রিটিশদের ভারত সংক্রান্ত আর্থিক নীতিগুলি ছিল অত্যন্ত কঠোর আর নির্মম। এ ব্যাপারে তাঁরা ভারতীয় নেটিভ প্রজাদের প্রতি কোনও সহানুভূতি দেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। ব্রিটিশ জমানায় ভারতকে একাধিকবার দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গলার মতো দুর্ভিক্ষ তাড়িত ফাটা কপাল বোধহয় আর কারুরই ছিল না। এই ঘাতক দুর্ভিক্ষগুলির মধ্যে প্রথমটি হয় ১৭৭০ সালে, ও তারপর ক্রমান্বয়ে ১৭৮৩, ১৮৬৬, ১৮৭৩, ১৮৯২, ১৮৯৭ এবং সর্বশেষ ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ।

ইংরেজরা দেশজুড়ে অর্থকরী ফসল উৎপাদনের উপর বাধ্যতামূলক ফতোয়া জারি করে। বলা বাহুল্য, এর একমাত্র কারণ ছিল রপ্তানি। ফলে এতদিন যে সমস্ত কৃষকরা ধান ও অন্যান্য সবজি চাষ করতেন তাঁরা বাধ্য হয়ে নীল, পোস্ত ইত্যাদি চাষে নিযুক্ত হলেন, যার ফলে তাঁদের অর্থাগম হলেও আপৎকালীন ত্রাণ ও খাদ্যের চাহিদা মেটানোর কোনও উপায় অবশিষ্ট থাকলো না। দুর্ভিক্ষের সময় সঞ্চিত খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার শূন্য হলো। যে স্বাভাবিক কারণগুলির ফলে দুর্ভিক্ষ হয় এক্ষেত্রে তা ছিল তুচ্ছ। বস্তুত ইংরেজদের অতিরিক্ত মুনাফা লাভের তীব্র বাসনার ফলেই বাঙ্গলার ভাগ্যাকাশে নেমে এল এই ভয়াবহ পরিণতি। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য কোনও ত্রাণের ব্যবস্থা তো ছিলই না, উপরন্তু কর বাড়িয়ে রাজস্ব ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হলো। আর শ্লেষের কথা এই যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭১ সালের ভরা দুর্ভিক্ষের মরশুমে কর বাড়িয়ে যে পরিমাণ মুনাফা লাভ করেছিল তা ১৭৬৮ সালের মুনাফার পরিমাণকেও ছাপিয়ে যায়।

এদিকে সমগ্র ইউরোপকে হিটলার নামক দানবের হাত থেকে রক্ষা করার অন্যতম নায়ক ব্রিটেনের স্বনামধন্য যুদ্ধবিশারদ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল কিন্তু বাঙ্গলার এই প্রাণঘাতী দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে প্রেরিত ত্রাণের ওষুধ ও খাদ্যদ্রব্য বাঙ্গলায় না পাঠিয়ে তা ইউরোপে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। যদিও সেই সময় ওই সেনাবাহিনীদের রসদের অভাব বা অতিরিক্ত প্রয়োজন— কোনোটাই ছিল না। আর এই বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, 'দুর্ভিক্ষ হোক বা না হোক, ভারতীয়রা খরগোশের মতোই বংশ বিস্তার করবে।' দিল্লির সরকার যখন পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্বলিত দুর্দশার বিস্তারিত চিত্র ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান টেলিগ্রাম করে তাঁর কাছে পাঠান, তা দেখে চার্চিলের সংক্ষিপ্ত উত্তর ছিল, 'তা হলে গান্ধী এখনো মরেনি কেন?'

সংক্ষেপে এই উক্তিটিই প্রমাণ করে স্বাধীনতার পূর্বে বাঙ্গলার চাষিদের বর্তমান অবস্থা ঠিক কীরকম ছিল এবং কী পরিমাণ দুর্দশার সম্মুখীন হতে হতো প্রতিনিয়ত। এতো কিছুর পরেও বাঙ্গলার কৃষক তাঁর কঠিন পরিশ্রম, অপরাজেয় মানসিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের জেরে বাঙ্গলাকে মরুভূমিতে পরিণত হতে দেয়নি এবং দেশের শস্যভাণ্ডারকে মজবুত করেছে। অপারেশন গ্রিন রেভেলিউশানের সহায়তা না পেলেও, চাষের ন্যায্য মূল্য না পেলেও সে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশকে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে দেয়নি। তাই আজ স্বাধীনতার অমৃতমোহৎসবে আমাদের উচিত অবশ্যই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। □

With Best Compliments from -

A Well Wisher

সংবিধানে দেশের মাটির গন্ধ থাকা দরকার

দুর্গাপদ ঘোষ

একটা দৃশ্য দেখে বিশ্ববাসী সেদিন বিস্ময়ে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কাঁচাপাকা চুল-দাঁড়িওয়ালা ঋজু চেহারার একজন মানুষ একটা মন্দিরের প্রবেশ পথের প্রথম সিঁড়িতে প্রায় সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন। তারপর ধীর কিন্তু দৃঢ়পদে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে প্রবেশ করলেন গর্ভগৃহে। সেখানে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিকে জোড়হাতে নমস্কার করার পর গিয়ে বসলেন তাঁর জন্য নির্ধারিত আসনে। সময় : ২০১৪ সালের মে মাস। তিনি অন্য কেউ নন, নবনির্বাচিত সাংসদ, নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠ দলের নির্বাচিত পরিষদীয় নেতা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী।

এর আগে কেবল স্বাধীন ভারতেই নয়, সারা বিশ্বের কোনো নেতাকে আইনসভায় প্রবেশ করার সময় এইভাবে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে প্রবেশ করতে কেউ দেখেননি। মোদী সেদিন ভারতের সংসদে প্রবেশ করার সময় এটা করেছিলেন কারণ তিনি মনেপ্রাণে অন্তরাত্মায় বিশ্বাস করেন যে আইনসভা তথা সংসদ কিংবা বিধানসভা ভবন হলো গণতন্ত্রের মন্দির এবং সংবিধান হলো সেই পীঠস্থানের ধর্মগ্রন্থ। যাতে লিখিত বা উল্লেখিত প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্যই হলো 'বেদবাক্য'। অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। মোদী সেদিন গোটা বিশ্বকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, কোনো জাতির জীবনে গণতন্ত্রই হলো একাত্ম মানবতাবাদ। যে কোনো জাতি, যে কোনো রাষ্ট্র মাথা উঁচু করে টিকে থাকে যদি তার জাতীয় জীবনে মজ্জায় মজ্জায় মানবতা নিহিত থাকে। সে মানবতা থেকে জন্ম নেয় বহুত্ববাদী মানসিকতা।

নাগরিকদের ধর্মীয় মতবাদ বা উপাসনা পদ্ধতি এবং নিজ নিজ উপাস্য বা ঈশ্বরের প্রতি আস্থার অধিকার হরণ করা হলে সেই 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রতন্ত্র অরাজকতাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

প্রকৃত গণতন্ত্র বা জনতন্ত্র। 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটা রাজতন্ত্রের জমানা থেকে প্রজা কল্যাণের লক্ষ্যে পরম্পরাগতভাবে চলে আসছে। এই কারণে প্রথাগতভাবে ইংরেজি রিপাবলিক শব্দের ভাষান্তরে আমরা এখনো তা ব্যবহার করে থাকি। অন্যথায় আজকের জমানায় এটা আসলে জনতন্ত্র, গণতন্দ্র, লোকতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র। এখন বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই রাজতন্ত্র তথা রাজা-প্রজার সম্পর্ক নেই। সাধারণ মানুষ বা জনগণের প্রতিনিধিত্বে দেশ পরিচালনার যে ব্যবস্থা বা শাসনতন্ত্র তাকে তত্ত্বগতভাবে বলা হয় সাধারণতন্ত্র। অর্থাৎ সর্বসাধারণের শাসনতন্ত্র। ইংরেজিতে 'ডেমোক্রেসি'। তবে এই জাতীয় শাসনতন্ত্রে সর্বসাধারণের ব্যক্তিগত বা মৌলিক অধিকার থাকলেও যে যার মতো, যার যেমন খুশি চলতে পারে না। অন্যের অধিকার, অন্যের সুবিধা-অসুবিধার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানবিক নীতিতে চলতে হয়।

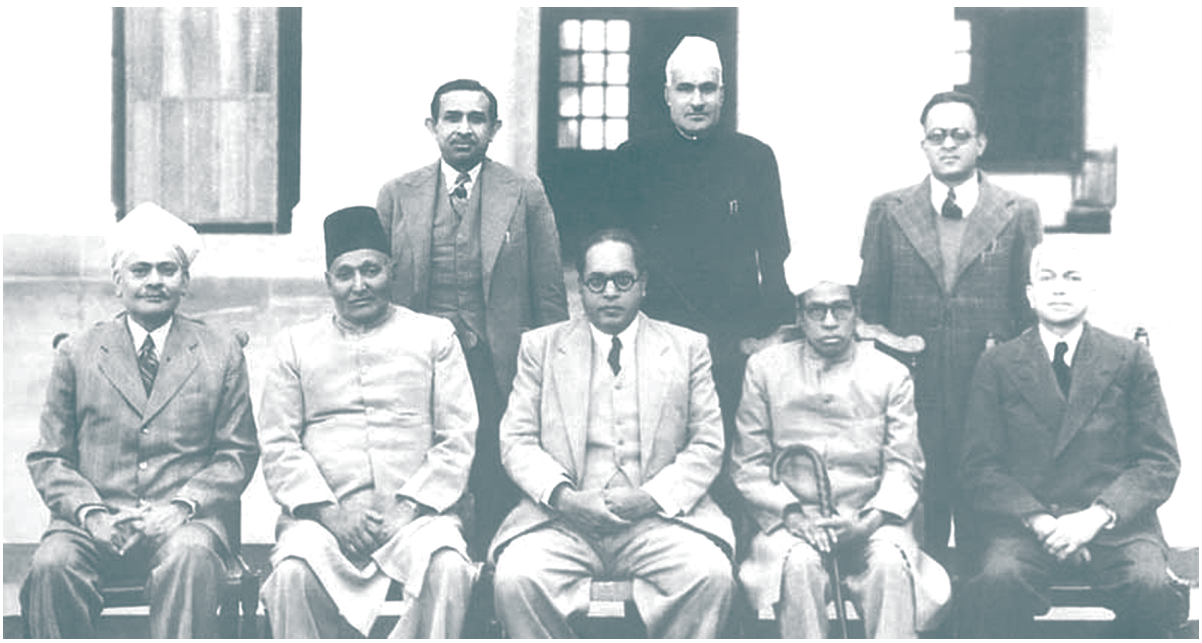

অর্থাৎ প্রত্যেককে মেনে চলতে হয় কিছু নির্ধারিত নীতি। তেমনি তাদের প্রতিনিধিদেরও নির্ধারিত নীতি ও নির্দেশ মেনে শাসন তথা দেশ পরিচালনা করতে হয়। এই নীতি-নির্দেশই হলো আইন। যে কোনো নাগরিকের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে দেশ বা রাষ্ট্রের তরফে যে সমস্ত নির্দিষ্ট নীতির ব্যবস্থা থাকে তাহলো আইন। ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য থাকা দরকার। এজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা Polity-র ভাষায় বলা হয়ে থাকে 'Law is the condition of liberty'। এই নীতি যদি 'ধর্ম' হয় কিংবা 'ধর্ম' যদি জীবনশৈলীর নীতি হয় তাহলে বলা যেতে পারে সুনির্ধারিত নীতি বিষয়ক গ্রন্থ হলো 'সংবিধান'। যাকে রাষ্ট্রতন্ত্র বা শাসনতন্ত্রের ধর্মগ্রন্থ বলা যেতে পারে। আর সেই ধর্মগ্রন্থের পবিত্র পীঠস্থান হলো সংসদ বা আইনসভা। মোদী সেদিন সংসদ ভবন নামে গণতন্ত্রের যে মন্দিরে প্রণাম করে প্রবেশ করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে তা ছিল ন্যায়ধর্ম, নীতিধর্ম তথা জনতা জনার্দনের উদ্দেশে তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে নিবেদন করা। জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে যিনি বা যাঁরাই এখানে প্রবেশ করেন তিনি বা তাঁরা সকলেই গণদেবতার কাছে নিবেদিত এবং দায়বদ্ধ। যেদিনে ভারতবর্ষ নামের এই রাষ্ট্রতন্ত্রের ধর্মগ্রন্থ বা নীতিগ্রন্থ কার্যকর হয়েছে এদেশে সেই দিনটা হলো সাধারণতন্ত্র দিবস।

সংবিধান যেহেতু সর্বসাধারণের রাষ্ট্রতন্ত্র বা শাসনতন্ত্রের নিয়ম-নীতিশাস্ত্র সেজন্য কোনো রাষ্ট্রের সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান সে দেশের মানুষের জীবনশৈলীর পরম্পরার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তার অনুসারী হওয়া একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। তাতে সংশ্লিষ্ট দেশের পরম্পরাগত কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং যে কোনো ধর্মীয় আস্থার মানুষের সম্পর্কে সমান নীতি গৃহীত হওয়া একান্ত অনিবার্য। সর্বোচ্চ পদের অধিকারী থেকে শুরু করে একেবারে প্রান্তিক যে কোনো অবস্থার প্রত্যেক মানুষের প্রতি সম মনোভাব ও সমানাধিকারের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ থাকা আবশ্যক। প্রত্যেকেরই মৌলিক অধিকার যাতে সুরক্ষিত থাকে সেই নীতিও নির্দিষ্টভাবে সংবিধানে বিধৃত থাকা জরুরি। বিশেষ করে প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্মীয় স্বাধীনতা যাতে সমানভাবে রক্ষিত হয়, সকলের জন্য সমান আইন, সে দেওয়ানি কিংবা অপরাধিক যাই হোক না কেন, তা এক বা সমান এবং অভিন্ন হওয়ার কোনোরকম বিকল্প না থাকা বাঞ্ছনীয়। এ দেশে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য একই আইন যাতে প্রণয়ন ও কার্যকর হয় সংবিধানে তার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকা অবশ্যই জরুরি। কারণ আইন প্রণয়ন হয় সংবিধান অনুসারে। সংবিধানে সম্পৃক্ত নির্দিষ্ট ব্যবস্থাবলীকেই বলা হয় বিধি। সংবিধানে বিধি নিবদ্ধ থাকে বলেই বলা হয় বিধিবদ্ধ সংবিধান বা সাংবিধানিক বিধিবদ্ধতা। সেটা না হলে রাষ্ট্রতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেই সংবিধানকে গণতন্ত্রের আদর্শ নীতিশাস্ত্র বলা যায় না। এক কথায় কোনো দেশের সংবিধানে সে দেশের সর্বসাধারণের প্রবহমান জীবনযাত্রার পরম্পরার সঙ্গে নাড়ির যোগ তথা সে দেশের মাটির গন্ধ থাকা দরকার। সেই সঙ্গে যে কোনো মূল্যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার অঙ্গীকার বিধিবদ্ধ থাকার বিষয়টা আলাদা করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিধি বা আইন প্রণয়ন হয় সংবিধান অনুসারে। কিন্তু খুব বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ভারতীয় সংবিধানে এদেশের পরম্পরার সঙ্গে নাড়ির সম্পর্কের সেই পবিত্র বিষয়গুলো যেন অনেক ক্ষেত্রেই একাত্মভাবে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। আমাদের এই সংবিধান রচয়িতাদের নিয়ে যতই অহংকার করা হোক না কেন, সকলেই জানেন যে তাঁদের শীর্ষস্থানীয়রা প্রায় সকলেই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অনুপ্রাণিত। তাঁরা বস্তুত অলিখিত ব্রিটিশ সংবিধান তথা ওয়েস্ট মিনিস্টার প্যাটার্ন-এর সংবিধানকে প্রায় অনুলিপির মতো করে ভারতীয় সংবিধান রচনা করেছেন। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তা পরম্পরাগত ভারতীয় জীবনশৈলীর সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারেনি। পুরোপুরিভাবে একাত্ম হতে পারেনি। সেটা সম্ভবও নয়। কারণ এক দেশের মানুষের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার সঙ্গে অন্য দেশের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার প্রায় হুবহু মিল থাকতে পারে না। খেজুর রসের হাঁড়িতে চিনিগোলা জল ভরে দিলে তা কখনো খেজুর রস হয় না। ব্রিটিশ বা পাশ্চাত্য জীবনশৈলীর সঙ্গে ভারতীয় জীবনশৈলীর বিস্তর ফারাক। পরম্পরাগতভাবে সময়ের পার্থক্যও অন্তত কয়েক হাজার বছরের। কিন্তু এখনো, এই ২০২২ সালেও ভারতীয় সংবিধানে নিবদ্ধ বিধি মোতাবেক কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদেশে ১৮৩৫ সালের ব্রিটিশ আইন প্রায় যথাযথভাবে বহাল রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে বিশেষ করে দেওয়ানি আইনের ক্ষেত্রে এমন অনেক অসঙ্গতি বা ত্রুটি থেকে গেছে যা অনবরত সংশোধন করতে হচ্ছে।

পাশ্চাত্যশৈলীর জীবনযাত্রায় পরিবার বলতে বোঝায় কেবল স্বামী-স্ত্রী এবং বড়োজোর তাঁদের সন্তানরা যতদিন পর্যন্ত নাবালক থাকে। অন্যদিকে ভারতীয় সমাজে পরিবারের মূল ধারণা হলো একান্নবর্তী। এখানে ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্র বিশেষে ৩০-৩২ বছর বয়েস পর্যন্ত বাবা-মাকে খাইয়ে পরিয়ে 'উপযুক্ত' বা 'মানুষ' করতে হয়। ছেলেদের বিয়ে হলেই তারা অন্য একটা আলাদা পরিবার বলে বিবেচিত হয় না। মেয়েদের উপযুক্ত করে সাধ্যাতীত খরচপাতি করে পাত্রস্থ করার দায়িত্ব তাদের মা-বাবার বা পরিবারের ওপর বর্তায়। সুতরাং এক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত আইন পাশ্চাত্যের অনুসারী হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়।

মা-বাবারা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করবেন, ছেলে-মেয়েরা মা-বাবার সম্পত্তির সমান অংশীদার হবে অথচ ছেলে-মেয়েরা অসহায় বাবা-মাকে দেখবে না। মেয়েরা বিয়ের পর তাদের স্বামীর যাবতীয় পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হবে অথচ মা-বাবাকে কিংবা স্বামীর বাবা-মাকে দেখতে বাধ্য থাকবে না এরকম আইন ভারতীয় পরিবার পরম্পরার অনুকূল নয়। ছেলে-মেয়েকে প্রয়োজনে সর্বস্বান্ত হয়ে উপার্জনক্ষম করাবেন তাদের বাবা-মায়েরা অথচ ছেলে-মেয়েদের উপার্জিত অর্থ বা সম্পত্তির ওপর তাঁদের কোনো অধিকার থাকবে না। সে অধিকার বর্তাবে পুত্রবধূ কিংবা জামাতাদের ওপর,

ছেলে-মেয়েদের উপযুক্ত করার ক্ষেত্রে যাদের কোনো ভূমিকা থাকে না। এই জাতীয় নানা অসঙ্গতির এবং আরও কিছু কারণে এই নিবন্ধ যন্ত্রস্থ হওয়া পর্যন্ত ৭১ বছরের মধ্যে ভারতীয় সংসদে সংবিধানে ১২৭ বার সংশোধনের প্রস্তাব পেশ হয়েছে এবং ১০২ বার সংশোধন ঘটানো হয়েছে। মোটামুটি পরিসংখ্যান ধরলে গড়ে প্রতি ৭-৮ মাসের মধ্যে যে সংবিধান সংশোধন করতে হয় তা যে কতখানি ত্রুটিপূর্ণ তা খুব সহজেই অনুমান করা যায়।

তত্ত্বগতভাবে ইংরেজিতে State এবং বাংলাভাষায় রাষ্ট্র (বা রাজ্য) হলো রাজনৈতিক একক। অন্যদিকে Nation বা জাতি হলো সাংস্কৃতিক ধারণা। 'A State is a unit of Politics but the nation is a concept of culturen হিন্দিতে nation-কে অবশ্য রাষ্ট্র বলা হয়ে থাকে। বলা হয় যে আমরা যখন জাতীয়তাবাদ কিংবা জাতীয় রাজনীতির কথা বলি তখন প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক পরম্পরার সঙ্গে একাত্ম মানবতাকে সম্পৃক্ত করেই তা বলে থাকি। ভারতবর্ষ যেহেতু হিন্দুবহুল দেশ এবং হিন্দুত্ব যেহেতু পরম্পরাগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী তথা বহুত্ববাদী, মনে হয় এদিকে তাকিয়েই সংবিধান রচয়িতারা সংবিধান পরিষদে আলোচনার সময় 'সেকুলার' শব্দটাকে আর আলাদা করে সংবিধানের প্রস্তাবনায় সন্নিবেশিত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু বাস্তবে সেই হিন্দুদের চরম বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। নেহরুর জমানায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে 'হিন্দু কোড বিল'।

ভারতীয় সংবিধানের একেবারে মূল কথাগুলো অতি সংক্ষিপ্ত আকার এর Preamble বা প্রস্তাবনায় তুলে ধরা হয়েছে। তাতে সেকুলার শব্দটা সন্নিবেশিত ছিল না। ১৯৭৫ সালে সারা দেশে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করে এক কথায় পঙ্গু করে ফেলা সংসদে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন ঘটিয়ে নেহরুকন্যা ইন্দিরা গান্ধীর সরকার শব্দটাকে লিখিত আকারে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন। তার ফলে এখন প্রস্তাবনার শুরুতেই কথাগুলো দাঁড়িয়েছে এইরকম :

তত্ত্বগত দিক থেকে সেকুলার বা 'ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন' বর্তমান সংবিধান পরিবর্তন করে এখন ভারতকে সর্বধর্ম সমভাবের 'ধর্মনিরপেক্ষ' হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করা উচিত। অন্যথায় তথাকথিত সেকুলারইজমের আড়ালে বৃহত্তম হিন্দু সমাজ নিরন্তর বৈষম্যের শিকার হলে একদিন এদেশ থেকে প্রকৃত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

We the people of India into a Sovereign, Democratic, Socialist, Secular Republic...। এতে হিন্দুত্বের হৃদয়তন্ত্রীতে সর্বধর্ম সহিষ্ণুতা তথা সমস্ত ধর্মমত সম্পর্কে যে সমান মনোভাবের পরম্পরা প্রবাহিত হয়ে আসছে সেই বিশালতা যে কালিমালিপ্ত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর গোড়াপত্তন হয়েছে আদতে সমাজতন্ত্রবাদী নেহরুর 'ধর্মনিরপেক্ষ' মানসিকতা থেকে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটাকে এখানে ইনভার্টেড কমার মধ্যে রাখা হলো। কারণ, এই শব্দের সামান্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ইংরেজি অভিধানে সেকুলার শব্দের অর্থ করা হয়েছে Which is not related to the religion--- যা ধর্মীয় মতবাদের সম্পর্কবিচ্যুত। ১৯৪৯ সালে সংবিধান পরিষদ এ নিয়ে আলোচনাকালে সেকুলারিজম-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পাশ্চাত্যে শিক্ষিত (foreign trained) ব্যারিস্টার নেহরু বলেছিলেন, 'Secularism to be a Complete Separation of the Church and the State'। লক্ষনীয় নেহরু ধর্মের অনুষঙ্গে 'church' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য দীক্ষায় কতখানি প্রভাবিত ছিলেন। অর্থাৎ ঘুরিয়ে বললে সেই একই কথা— সেকুলার রাষ্ট্র হবে ধর্মবিচ্যুত। কিন্তু তাঁর এই ব্যাখ্যা সংবিধান পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের অনেকেরই মনঃপূত হয়নি। বিশেষ করে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের। পরিষদের সভাপতি তথা 'ভারতীয় সংবিধানের জনক' ড. বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরেরও এই ব্যাখ্যা পছন্দ হয়নি। ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরম্পরায় শাসনতন্ত্র হলো রাষ্ট্রধর্ম। নেহরু যে 'ধর্ম' এবং রিলিজিয়ন-এর মৌলিক পার্থক্য জানতেন না তা নয়।

ডিসকোভারি অব ইন্ডিয়া গ্রন্থে তিনি নিজেই লিখেছেন, 'Dharma is something different from Religion'। কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ। রিলিজিয়নের আভিধানিক অর্থ ভারতীয় ভাষায় 'ধর্ম' করা হলেও ধর্ম ও রিলিজিয়ন এক নয়। ধর্ম হলো ন্যায়নীতি, কর্তব্য এবং সর্বপ্রাণে একাত্মতা সমৃদ্ধ জীবনশৈলী। আর রিলিজিয়ন হলো ধর্মীয় মতবাদ, মজহব, উপাসনার পদ্ধতি। অতএব, কোনো রাষ্ট্র যদি ধর্মবিচ্যুত হয় তবে তো তা নীতিহীন, ন্যায়হীন, কর্তব্যহীন, নাগরিকদের সঙ্গে একাত্মতাহীন এক থান ইটের মতো শাসনতন্ত্র হবে। এহেন সেকুলার সংবিধান অনুসারে শাসনতন্ত্র পরিচালিত হলে নাগরিকদের জীবনশৈলীর সঙ্গে তার তো অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকার কথা নয়। এখন তো দেখা যায় অনেক তাবড়-তাবড় সেকুলার নেতা প্রকাশ্যেই বলে থাকেন তাঁরা 'ধর্মসংকটে' পড়ে গেছেন। কোন দলে যাবেন, কোন নেতাকে মানবেন ঠিক করতে পারছেন না। এই ধর্মসংকট মানে কোন রিলিজিয়নের সংকট? আসলে তাঁরা নীতির সংকটের কথাই বোঝাতে চান। নেহরুর সঙ্গে সেকুলার শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের মতপার্থক্য ও মনোমালিন্য এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রপতির হাতে পুনর্নির্মিত

সোমনাথ মন্দির উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ঘোরতর আপত্তি তুলেছিলেন। নেহরু মনে করেছিলেন 'সেকুলার' ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান ধর্মীয় মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করলে ভারতের 'সেকুলার' ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। প্রসঙ্গত, ১০২৫ সালে গজনির সুলতান মামুদের হাতে লুণ্ঠিত ও ধ্বংস হওয়া সোমনাথ মন্দিরের জায়গায় যে ইদগাহ ছিল, ভারত স্বাধীন হবার পর পরই সেই ইদগাহ সরিয়ে সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণ করান প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল। প্যাটেলের প্রয়াণ ঘটলে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে একপ্রকার বাধাই দিয়েছিলেন ক্ষুব্ধ নেহরু। তাঁর সেকুলারইজমের ধারণা যে কতখানি হিন্দুত্ব-বিরোধী ছিল এই সমস্ত ঘটনা এবং হিন্দু কোড বিল তার প্রমাণ বহন করছে।

ভারতীয় সংবিধানের Directive Principles বা নীতি নির্দেশিকার ৪৪ নম্বর ধারায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়র জন্য এক বা সমান দেওয়ানি বিধির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সংবিধান গৃহীত হয়েছে ১৯৫০ সালের ২৬ নভেম্বর এবং কার্যকর হয়েছে ১৯৫১ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে। কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ সালে নেহরু সরকার হিন্দু ব্যক্তিগত আইন সংশোধন করে 'হিন্দু কোড বিল' চাপিয়ে দিয়েছে। নেহরুর নিজের ব্যাখ্যা অনুসারে সেকুলারইজম যদি ধর্মের সম্পর্ক বিচ্যুত হয় তাহলে কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মের গায়ে হাত দেওয়া হলো কেন? কেন অন্যান্য ধর্মের গায়ে আঙুলের স্পর্শটি পর্যন্ত লাগল না? যদি তা হতোও তাহলে তা কীসের ভিত্তিতে, কোন সংবিধানের অনুসারে করা হতো? ১৯৫৪-৫৫ সালে যে সংবিধান বলবত ছিল তাতে তো সেকুলার বা ধর্ম সম্পর্ক হীনতা তথা 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র কথা বিধৃত ছিল না! তাহলে যদি অভিযোগ করা হয় যে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কংগ্রেস সরকারই প্রথম সংবিধান লঙ্ঘন করেছিল তাহলে সেই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বা অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?

যার যে রিলিজিয়ন বা উপাসনাপদ্ধতি থাকুক না কেন, ভারতীয় সমাজ বা ভারতীয় জাতি সামগ্রিকভাবে ধর্মহীন কিংবা ধর্মবিচ্যুত নয়। বরং ধর্মনিষ্ঠ। কোনো রাষ্ট্র ধর্মবর্জিত হলে তা অধর্মতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। অনীতি বা দুর্নীতিতন্ত্রে পর্যবেশিত হয়। নাগরিকদের ধর্মীয় মতবাদ বা উপাসনা পদ্ধতি এবং নিজ নিজ উপাস্য বা ঈশ্বরের প্রতি আস্থার অধিকার হরণ করা হলে সেই 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রতন্ত্র অরাজকতাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। ভারতে রাজতন্ত্র, বাদশাহিতন্ত্র কিংবা ব্রিটিশ শাসনের জমানা কোনো সময়েই ধর্মহীন শাসনতন্ত্র ছিল না। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার দ্যোতক হলো সব সময়ই সমস্ত ধর্মমত সম্পর্কে পক্ষপাতিত্বহীনতা বা সর্বধর্ম সমভাব। ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যাত্যয় হয়েছে বটে কিন্তু বেদের আমল থেকে এখনও পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতাই এদেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি। ইংরেজি আভিধানিক ব্যাখ্যা ধরে তাকে বাদ দিয়ে সংবিধান রচিত বা সংশোধিত হলে তার সঙ্গে এদেশের সর্বসাধারণে সমাজ, জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি কোনো কিছুর সঙ্গেই নাড়ির সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। সেরকম সংবিধানে এদেশের মাটির গন্ধ থাকে না। এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা যেতে পারে, যে ধর্মনিরপেক্ষতা... Complete Separation of the Church and the State তা কি এদেশের আত্মার সঙ্গে নিবিড় ভাবে একাত্ম? এই ধরনের সেকুলার সংবিধানকে কি ভারতীয় পরম্পরার অনুসারী বলে বড়াই করা যায়? নেহরুর 'সেকুলারইজম'-এর ব্যাখ্যা ধরে যদি একথা বলা হয় যে এই সংবিধানকে স্রেফ ব্রিটেন থেকে কপি করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে কি খুব ভুল বলা হবে? প্রবহমানকাল থেকে ধর্মনিষ্ঠ ভারতের বৃহত্তম তথা চার-পঞ্চমাংশ গরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক এই সংবিধানের বদলে বিভক্ত ভারতের সংবিধান কি সর্বধর্মসহিষ্ণু হিন্দুরাষ্ট্রভিত্তিক হওয়া উচিত ছিল না? তা করা হলে ভারতবর্ষ কিন্তু ইসালামিক কিংবা ক্যাথলিক দেশের মতো হিন্দুধর্মীয় রাষ্ট্র হতো এমন নয়।

নেপাল রাজতান্ত্রিক এবং ঘোষিত হিন্দুরাষ্ট্র ছিল। কিন্তু অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কারও কোনো অধিকারই খর্বিত হয়নি। তা ছিল আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যেখান থেকে খামচা মেরে ভারতীয় সংবিধান রচনা করা হয়েছে সেই ব্রিটেনই বরং কাঠামোগত দিক থেকে রাজতন্ত্র হলেও তত্ত্বগতভাবে খ্রিস্টান তথা ধর্মীয় রাষ্ট্র। কারণ সবাই জানেন যে সেখানকার নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান রাজা কিংবা রানি হলেও আর্চ বিশপ অব ক্যান্টারবেরি যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের মাথায় মুকুট পরিয়ে এবং ধর্মদণ্ড স্পর্শ করে দেশ শাসনের অনুমতি না দেন ততক্ষণ পর্যন্ত রাজা বা রানি স্বীকৃত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে অধিকার লাভ করতে পারেন না। সেখানে সর্বোচ্চ অনুমতি বা অনুমোদনদাতা হলেন একজন শীর্ষস্থানীয় ধর্মযাজক। তাতে ব্রিটেনকে কেউ-ই কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র নয় এমন কথা বলতে পারেন না। ধর্মযাজকের অনুমতি সাপেক্ষে দেশ শাসন ব্রিটেনের পরম্পরাগত কৃষ্টি। তেমনি ভারতেরও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরম্পরার প্রবহমান কৃষ্টি রয়েছে। যা কেবল মহানই নয় সর্বভূতে একাত্ম, বসুধৈব কুটুম্বকম্ তত্ত্বে আস্থাশীল। ভারতের ইতিহাসও তার সাক্ষী।

কোনো সংবিধান একবার রচিত হলে তা আর সংশোধন বা পরিবর্তন করা যাবে না এমন তো নয়। বহুল না হলেও বিশ্বের একাধিক দেশের সংবিধানের আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। ভারতীয় সংসদেরও উভয় কক্ষে কেবল দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতাই নয়, পুরোপুরি সর্বসম্মতিক্রমে সম্পূর্ণ ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরম্পরার অনুসারী নতুন সংবিধান রচনা করা বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হওয়া উচিত হবে বলে মনে হয়। অর্থাৎ তত্ত্বগত দিক থেকে সেকুলার বা 'ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন' বর্তমান সংবিধান পরিবর্তন করে এখন ভারতকে সর্বধর্ম সমভাবের 'ধর্মনিরপেক্ষ' হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করা উচিত। অন্যথায় তথাকথিত সেকুলারইজমের আড়ালে বৃহত্তম হিন্দু সমাজ নিরন্তর বৈষম্যের শিকার হলে এদেশ থেকে প্রকৃত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। □

উপাসনা স্থল আইন ১৯৯১ প্রত্যাহার করা হোক

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

যখন ১৯৯০-এর গোড়ায় বাবরি মসজিদ-রামজন্মভূমি বিতর্ক তুঙ্গে পৌঁছেছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং অন্যান্য হিন্দু সংগঠনগুলো অন্য দুটো মসজিদের ওপর দাবি তুলেছিল, সেই দুটো মসজিদ হলো বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ আর মথুরার শাহি ইদগাহ।

যখন মন্দিরের অছি পরিষদ বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদের জায়গাটা দাবি করে আদালতে দেওয়ানি মামলা দায়ের করল সেই সময়ে নিরাপত্তার জন্য মথুরায় শাহি ইদ্‌গাহ্‌ আর কৃষ্ণ মন্দিরের মাঝে পাঁচিল তুলে নিরাপত্তারক্ষীর শিবির খোলা হয়েছিল। পিভি নরসিমা রাও সরকার উপাসনা স্থলগুলোর অবস্থান যথাপূর্বং রাখার কারণ দেখিয়ে ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটা বিশেষ আইন জারি করে। এই আইনে বলা হয় যে, যে কোনো উপাসনালয়ের ধর্মীয় চরিত্র ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট যা ছিল তাই বহাল থাকবে। এতে বলা হলো কোনো ব্যক্তি যে কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর উপাসনালয়কে অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে রূপান্তরিত করতে পারবে না। আইনে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের সংস্থান রাখা হলো, তার সঙ্গে জরিমানাও। কিন্তু অযোধ্যা বিতর্ককে এর আওতার বাইরে রাখা হলো। মূল কারণ এটা একটা দীর্ঘ প্রলম্বিত মামলার অধীনে ছিল। তাছাড়া আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সম্ভাব্য নিষ্পত্তির সুযোগও রাখা হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টে এই আইনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। কারণ মানুষের আদালতে যাওয়ার পথ আটকে দেওয়া হয়েছিল। প্লেসেস অব ওয়রশিপ অ্যাক্ট (স্পেশাল প্রভিশনস), ১৯৯১-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে আবেদন করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট সেই প্রেক্ষিতে এই মাসের শুরুতে কেন্দ্রের জবাব চেয়েছে।

> মুসলমানরা বুঝেছে যে তারা অসংখ্য মন্দির, মঠ ভেঙেছে, হিন্দুরা সঙ্গত কারণে তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে। তাকে আটকাতে এইরকম তানাশাহি আইন চালু করতে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা বাধ্য করেছিল পিভি নরসিমা রাওকে।

চ্যালেঞ্জের পয়েন্ট বা বিন্দুগুলো হলো :

(১) কোনো ব্যক্তি কোনো ধর্মের উপাসনালয়কে অন্য ধর্মের উপাসনালয়ে পরিবর্তিত করতে পারবে না।

(২) যে কোনো উপাসনালয় ১৫ আগস্ট,

১৯৪৭-এর অবস্থাতেই থাকবে।

(৩) দেশের সব উপাসনালয়ের অবস্থানকে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের অবস্থানে কার্যত আটকে রাখতে এই আইন জারি হয়েছিল।

চ্যালেঞ্জে এই প্রশ্ন খাড়া করা হয়েছে—এই আইনে কোনো সম্প্রদায় দ্বারা অন্য সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ের ওপর দাবি করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার আইনি বৈধতা কোথায়? রামজন্মভূমির ওপর হিন্দুদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে। ভাগ্যিস রামজন্মভূমিকে এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল।

প্রাচীন স্মারক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থল ও ধ্বংসাবশেষ আইন, ১৯৫৮ দ্বারা রক্ষিত প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মারক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থল ও ধ্বংসাবশেষসমূহের ক্ষেত্রে ১৯৯১-এর আইন প্রযোজ্য হবে না।

যেসব মামলার নিষ্পত্তি চূড়ান্তভাবে হয়ে গেছে বা কোনো বিবাদ যা ১৯৯১-এর এই আইন লাগু হওয়ার আগে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে তার ক্ষেত্রে এই আইন লাগু হবে না।

যারা এই অপরাধ সংঘটিত করার জন্য প্ররোচনা দেবে বা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে তারাও একই শাস্তি পাবে।

বিজেপির আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায় এই প্রশ্ন তুলেছেন যে এতে করে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের আইনি মামলার মধ্য দিয়ে তাদের উপাসনাস্থল পুনরুদ্ধার করার অধিকার হরণ করা হয়েছে। এর অর্থ মানুষের আদালতের মাধ্যমে বিচার চাওয়া ও বৈচারিক সুরাহা চাওয়ার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া।

তিনি আরও বলেছেন যে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট তারিখটা স্বেচ্ছাচারমূলক ও অযৌক্তিক।

মধ্যযুগে বহিরাগত আক্রমণকারীরা উপরোক্ত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ ও জৈনদের মন্দির বা উপাসনাস্থল ভেঙে দিয়েছিল। তাদের কাজকে এই আইন বৈধতা দেবে বলে আবেদনে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বিস্ময় প্রকাশ করে এতে বলা হয়েছে কোন যুক্তিতে এই আইনে রামজন্মভূমিকে অব্যাহতি দেওয়া হয় কিন্তু কৃষ্ণজন্মভূমিকে দেওয়া হয়নি। এই আইন ধর্মপালন ও প্রচারের অধিকারকে লঙ্ঘন করছে শুধু তাই নয়, উপাসনা স্থল চালনা ও প্রশাসন চালানোর অধিকারও লঙ্ঘন করছে। এটা ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করার সরকার যে দায়িত্ব তার বিরুদ্ধেও যাচ্ছে। মথুরায় এক শাহি ইদগাহ আছে, সেই জায়গার সঙ্গে কৃষ্ণের জন্মের সম্পর্ক আছে। এখানে কৃষ্ণের মন্দির আছে। যদি তর্কের খাতিরে কেউ ধরে নেন যে কৃষ্ণ ওখানে জন্মেছিলেন কিনা তার প্রমাণ নেই তাহলে একথাও তো ঐতিহাসিক পরম্পরা বা সমষ্টিগত স্মৃতি বলছে যে ওখানে কৃষ্ণের জন্মসম্পর্কিত এক মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তাহলে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে ওখানে একটা হিন্দু মন্দির ছিল কৃষ্ণ হোন বা নাই হোন। আমি নিজে ওই মসজিদে পরিণত মন্দির দর্শন করার সময়ে দেখেছি সেখানে মন্দিরের প্রচুর লক্ষণ বা চিহ্ন উপস্থিত। অযোধ্যা বিতর্কে তার চূড়ান্ত রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে এই আইন এমন এক আইন যা স্বাধীনতার পরে উপাসনা স্থল পরিবর্তন করার অনুমতি না দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করেছে!

বারাণসীর জেলা আদালত মন্দির ট্রাস্টের আনা এক দেওয়ানি মামলাকে গ্রহণ করেছে। এই মামলায় পুণ্যনগরী বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদকে মহাদেবের মন্দির বলে দাবি করেছে। কিন্তু সেই আদেশকে এলাহাবাদ হাই কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে, কারণ এই ধরনের মামলার উপর বিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে এই মামলায় উপাসনাস্থলের চরিত্র বদলানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়টা এখনো অমীমাংসিত আছে।

যখন হিন্দুরা দাবি জানাল ওর ওপর এক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ চালানো হোক, সার্ভে হওয়া দরকার, তার বিরুদ্ধেও চ্যালেঞ্জ জানানো হলো কারণ এটা সম্ভব নয়, তাতে উপাসনাস্থলের চরিত্র বদালানো হবে যা করা যাবে না। মসজিদকে মন্দির বা উলটোটা করা যাবে না।

উৎসাহী হিন্দুরা তো ৩০০০ মসজিদকে মন্দিররূপে দাবি জানানোর পক্ষে ছিল। কিন্তু আপাতত এই তিনটের উপর জোর দেওয়া হবে। তার মধ্যে রামজন্মভূমির বিষয়টা সুপ্রিম কোর্টের রায়ে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। মথুরায় আশ্চর্য ব্যাপার হলো এর মানে শাহি ইদগাহ মসজিদের জমির মালিকানা কৃষ্ণজন্মভূমির মালিকানাধীন অথচ তার ব্যবস্থাপনা ইদগাহ কমিটির হাতে।

আসলে সব পক্ষ বুঝেছে বিশেষত মুসলমানরা বুঝেছে যে তারা অসংখ্য মন্দির, মঠ ভেঙেছে, হিন্দুরা সঙ্গত কারণে তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে। তাকে আটকাতে এইরকম তানাশাহি আইন চালু করতে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা বাধ্য করেছিল পিভি নরসিমা রাওকে।

১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর আগে শাহি ইদগাহ নামে কোনো মসজিদ ছিল না বিহারের গভর্নর ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মিলে এক জালিয়াত সংগঠন তৈরি করেছিল। মন্দিরের পুরো প্রাঙ্গণের মালিক হয়ে বসেছে তারা। সেখানে এক জাল 'শ্রীকৃষ্ণ সেবা ট্রাস্ট' বানিয়েছে আর মথুরার কৃষ্ণ মন্দিরের জমি ইদগাহকে দিয়ে দিয়েছে। এদের নাম দ্বারকা প্রসাদ মিশ্র এবং এম.এ.এস. আয়েঙ্গার। জাল এনজিও-র সর্বেসর্বা এরা। ১৯৬৮-তে এই সমঝোতা হয়। কোর্ট এই কথা বলে দেয় যে ওরাই ট্রাস্টি। সুপ্রিমকোর্টে কোনো কেস করলে লোয়ার কোর্টে কেস খারিজ হয়ে যায়। তারপর সেই মসজিদকে (যা আগে মন্দির ছিল বলে জানা যায়) ইদগাহ মসজিদ বানানো হয়।

ইসলামে কোনো মাজারের কনসেপ্ট নেই। ইসলামে মসজিদ কোনো পবিত্র জায়গা নয়, শুধু নমাজ পড়ার জায়গা। নমাজ সব জায়গায় পড়া যায়। আরব দেশে বহু মসজিদ ভাঙা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে মসজিদ, ইদগাহ রাজনীতির বিষয় হয়ে যায়। মিথ্যের ওপর ইসলাম দাঁড়িয়ে, তাই ওরা মিথ্যে নিয়েই চলে। ওরা কত বড়ো মিথ্যেবাদী তার প্রমাণ ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের একটি কথা থেকেই পাওয়া যাবে। রামকে বিদেশি প্রমাণ করার জন্য তিনি লিখেছেন, রাম হামলা করতে ভারতে এসেছিলেন, রোম থেকে এসেছিলেন, তাই তার নাম রাম। ▯

বীর সাভারকর ও মহাবিদ্রোহ

স্বস্তিকার 'সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা' টি হাতে পেলাম। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এই সংখ্যাটি নানা বিদগ্ধজনের লেখায় সমৃদ্ধ, এটি সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা। নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতাযুগের কলম' বনাম আজকের 'ফেক আর পেড নিউজ' প্রবন্ধটি তথ্যসমৃদ্ধ রচনা। কিন্তু একটি বিষয়ে খটকা লাগল। তিনি লিখেছেন, '১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা বলেছিলেন বিনয়ক দামোদর সভরকর বা বীর সভরকর (এই বানান কি ইচ্ছাকৃত?)। কার্ল মার্কসও তাই মনে করেছিলেন। দুজনেই এ বিষয়ে গ্রন্থ লেখেন।'

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য, বিনায়ক দামোদর সাভারকর ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা নয়, এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতার 'প্রথম যুদ্ধ' বলেই চিহ্নিত করেছেন তাঁর লেখা ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মারাঠি ভাষায় প্রকাশিত এবং পরবর্তী বছরে (১৯০৯) হল্যান্ড থেকে ইংরেজি অনূদিত গ্রন্থ 'The Indian War of Independence'-এ। আর কার্ল মার্কস ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে কোথাও ভারতের জাতীয় বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেননি তাঁর লেখায়। আর ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের উপর তিনি কোনো বইও লেখেননি। বাস্তবে কার্লমার্কস ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস 'স্তম্ভলেখক' হিসেবে নিউইয়র্কের New-York Daily Tribune পত্রিকায় ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের উপর কিছু প্রবন্ধ লেখেন ১৮৫৭-৫৮ সময়কালে। আর ওই প্রবন্ধগুলিতে তাঁরা কোথাও এই বিদ্রোহকে 'ভারতের জাতীয় বিদ্রোহ' হিসেবে আখ্যায়িত করেননি।

পরবর্তীকালে মস্কোর The Institute of Marxism-Leninism তাঁদের ওই প্রবন্ধগুলি সংকলিত করে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে একটি পুস্তক লেখেন আর ওই সংকলনকর্তারা পুস্তকটির নাম দেন, 'The First Indian War of Independence 1857-1859' আর চালিয়ে দিলেন মার্কসের নামে। বস্তুত ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর এবং সেটা ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দেই। এরপরে এই বিদ্রোহের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সুরেন্দ্রনাথ সেন ১৮৫৭ এবং ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 গ্রন্থদুটি লেখেন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, মস্কোর মার্কসবাদীরা ভারতে মার্কসকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্যই তাঁর লেখাগুলি সংকলিত করে ওই নামে প্রকাশ করেন ১৯৫৯ সালে। ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে 'স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ' বলা মার্কসের কৃতিত্ব নয়, কিন্তু শ্রীমুখোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে ভুল ধারণা হতে পারে জাতীয়তাবাদীদের মনে। হয়তো নির্মাল্যবাবু মার্কসের লেখা বলে কথিত পুস্তকটি পড়লে এই বিভ্রান্তির শিকার হতেন না আর অন্যদেরও মার্কসবাদীদের চালু করা এই মিথ্যার শিকার হতে দিতেন না।

—হরলাল রায়,
গোলাপবাগ, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ।

যুবরাজের একটি মন্তব্য

সম্প্রতি যুবরাজের একটি মন্তব্যকে নিয়ে এত মাতামাতি বা হই চই করার উদ্দেশ্য কী হতে পারে? একজন বর্ষীয়ান টিএমসি নেতা তো বলেই দিলেন এটাই তো পার্টির লাইন। যদি সত্যিই তাই হয় তাহলে পার্টির পক্ষ থেকে সেটা এতদিন কার্যকরী করা হয়নি কেন? যুবরাজ মন্তব্য করেছিলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে সব রকম জনসমাবেশ আগামী দু'মাস অন্তত বন্ধ রাখা উচিত হবে। নিঃসন্দেহে সুপরামর্শ। তাহলে সেটা কার্যকরী করার ব্যবস্থা সরকার পক্ষ থেকে নেওয়া হয়নি কেন এতদিন? রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। একদিনে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৪ হাজারের গণ্ডী অতিক্রম করেছে। অথচ মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গঙ্গাসাগরে স্নান এবং গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষ্যে লক্ষাধিক ভক্ত ও সাধু সন্ন্যাসীর সমাবেশ ঘটছে যারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসছেন। এরা যে কেউ করোনা আক্রান্ত হবেন না তা তো নয়। এরা যখন নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যাবেন হয়তো করোনা সংক্রমণ নিয়েই ফিরে যাবেন এবং নিজ নিজ রাজ্যে সংক্রমণ ঘটাবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগরে স্নান এবং মেলা বন্ধ রাখার কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। কেন? সরকারের আর্থিক দুরবস্থাকে কিছুটা চাঙ্গা করতে? উত্তরটা সঠিক জানা নেই। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে গঙ্গাসাগর মেলায় কয়েক লক্ষ মানুষের জনসমাগম করোনা বা ওমিক্রমনের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই অন্যান্য রাজ্যেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে যার ফল হবে মারাত্মক।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়োবাজার,
চন্দননগর।

ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা দর্শনের প্রেক্ষাপটে স্বামী বিবেকানন্দ

ধর্ম শাশ্বত। হিন্দু ধর্ম বলে, ঈশ্বর সর্বত্রই বিরাজমান। পৃথিবীর অপর সমুদয় ধর্মগ্রন্থ অপেক্ষা বেদ বহু প্রাচীন। সংস্কৃতে বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। বেদের কতক অংশের নাম উপনিষদ। শ্রীভগবান কোথায় এবং কীভাবে থাকেন, মানুষ ও জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ইত্যাদি জানা যায় উপনিষদ থেকে। বেদের সার উপনিষদ, উপনিষদের সার শ্রীমদ্ভগবতগীতা। বর্তমানে সারা বিশ্বে শ্রীমদ্ভগবতগীতার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। বর্তমান ভারতে ধর্ম ও সমাজের ক্রমপরিবর্তনে বিভিন্ন ধর্ম সংমিশ্রণের ফলশ্রুতি হিসেবে বিবর্তনধর্মী প্রতিক্রিয়ার

সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তস্বরূপ দুটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। যার কারণস্বরূপ বলা যায় জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক দৃষ্টান্তস্বরূপ দুটিই বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করেছে। কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে ও তার চেয়ে বেশি বিকলাঙ্গ হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর শান্তি রক্ষায় ভার্সাই চুক্তি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুদ্ধ নয় শান্তি প্রত্যাশী বিশ্ববাসী জাতিসঙ্ঘ গঠন করেছে কিন্তু আমরা যদি অনুপুঙ্খ দৃষ্টিতে দেখি দুয়ারে শমনস্বরূপ তৃতীয় মহাযুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বে এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শিক্ষার পাঠ্য বিষয়ে মানবিক দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলে আমি মনে করি। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় চিন্তা জগতে অনেক দিন থেকে আলোড়ন আনার চেষ্টা করেছেন। তিনি শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে Education is the manufactestion of perfection, already in man। তাঁর মতে জ্ঞান মানুষের অন্তরের জিনিস। বাইরে থেকে জ্ঞান আসে না। মানুষের মনই হলো বিশ্ব প্রকৃতি। তিনি শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে সমাজ চেতনার সমন্বয় সাধন করেছেন। সুখের বিষয়, সম্প্রতি ইউনেস্কো ভারতের দুর্গাপূজাকে স্বীকৃতি প্রদান করে ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতিকে অত্যুচ্চে তুলে ধরেছে।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
রাশিডাঙ্গা, কোচবিহার।

যত দোষ নন্দ ঘোষ

কথায় আছে যত দোষ নন্দ ঘোষ। এখন দেখছি নন্দ ঘোষের জায়গাটা কেউ কেউ হিংসাবশত মোদীজীকে দিয়ে দিয়েছেন। আসলে আমরা ভেতরে ভেতরে ভিখারিতে পরিণত হয়েছি। সব সুবিধা আমাদেরই চাই। আমরা কিছু দেব না। ভোট? তা বিনিময়ে কিছু চাই। ব্যক্তি জীবনে আমরা কী করি? মোটর গাড়ি বা মোটর সাইকেল অথবা স্কুটি থাকলে সারিয়ে সারিয়ে ব্যবহার করি। রাষ্ট্রজীবনে এর ব্যতিক্রম হবে কীভাবে। আমরা কি দেশকে ভিখারির দেশে পরিণত করব? নাকি আমাদের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপ্রধানরা বিশ্বের দরবারে যেভাবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতেন তা আবার ফিরিয়ে আনবো? যদি রক্ষণাবেক্ষণের কোনো ত্রুটি থাকে তাহলে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। তার জন্য বুলেট ট্রেনের প্রশ্ন উঠবে কেন? কখনো কি আমরা ভেবে দেখেছি, জাপান আমাদের পরে স্বাধীনতা পেয়ে কীভাবে শক্তিধর দেশ হলো? আসলে আমরা ইতিবাচক ভাবনা ভাবতে ভুলে গেছি। নতুন ভারত, আধুনিক ভারত গড়তে ইতিবাচক ভাবনা থাকা আবশ্যক। এইতো দিল্লির পুলিশ ফুলের বাজারে ৩ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করে নাশকতার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করল। এই দিল্লির পুলিশ আমাদের রাজ্যে বসে সন্ত্রাসবাদীরা জাল আধার কার্ড, জাল পাসপোর্ট তৈরি করতো তার পর্দাফাঁস করেছে। কই তখন তো কোনো সংবাদমাধ্যম বা নেট দুনিয়া তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা অমিত শাহদের সাধুবাদ জানাননি।

—শ্যামল হাতি,
চাঁদমারী রোড, হাওড়া-৯।

এ কেমন স্বাধীনতা

'৭৩তম সাধারণতন্ত্র দিবস সারা দেশে পালিত হচ্ছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দিনটিতে ভারতবাসী ২০০ বছরের পরাধীনতা থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালে ২৬ জানুয়ারি ভারত গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিত হয়। প্রাচীন ভারতের সম্পদ ও ঐশ্বর্যকে ইংরেজরা প্রায় লুঠ করে নিয়েছিল। ২০০ বছরের শাসন আর শোষণ করে ভারতমাতাকে প্রায় নিঃস্ব করে দিয়েছিল। তবুও ভারতমাতার বীর সন্তানেরা তাঁদের আত্মবলিদানের মাধ্যমে ভারতমাতাকে পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করেছিলেন। তাঁরা এক নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভারমাতার সমস্ত সন্তান সুখে শান্তিতে বসবাস করবেন। সারা পৃথিবীর কাছে গর্ব ছিল, আমার দেশ পন্থনিরপেক্ষ হিসেবে। কিন্তু স্বাধীনতার সত্তর পর আমরা সব ভারতবাসী স্বাধীনতার সেই সুখে ভোগ করতে পারিনি। এখনও সব ভারতবাসী দুবেলা দুমুঠো ভাতের জোগাড় করতে পারেন না। অনাহারে ও বসবাসহীন ভাবে এখনও ফুটপাতে রাস্তায় দিন কাটায় অনেক মানুষ। ধর্মের নামে ভেদাভেদ আগের থেকে বেড়েছে আর অসহিষ্ণুতায় গ্রাস করে নিয়েছে অনেক মানুষকে। হিংসা মারামারি ও রাজনীতিক সন্ত্রাস মানুষের বাক্‌স্বাধীনতাকে হরণ করে নিয়েছে। আমরা কোথাও যেন একটা গণতন্ত্রের নামের বেড়ি পায়ে পরে আছি। দেশকে যারা আজ নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা গণতন্ত্রের বুলি মুখে বলে দেশের সাধারণ মানুষের সমূহ ক্ষতিসাধন করছেন। সাত দশকের স্বাধীনতায় এখনও দেশের কৃষকেরা বঞ্চিত। তাদের সামান্য ভাতা ও ভতুর্কি দিয়ে সরকার আজ ক্লান্ত। তারা কিন্তু অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে সবার মখে আহার জুগিয়ে যাচ্ছেন। তাদের বঞ্চনা ও যন্ত্রণার কথা কেউ কান দেন না। দেশের বীর সৈনিকগণও আত্মত্যাগের যথাযথ সম্মান পান না। স্বাধানতার সুখ কেবল দেশের নেতা মন্ত্রীদের জন্য। তাঁরা জনগণের পয়সায় ইচ্ছামতো সুখ শান্তি ভোগ করবেন। আর সাধারণ মানুষ তাদের দয়া পাওয়ার আশায় বসে থাকবেন। তবে এ কেমন স্বাধীনতা। এক শ্রেণীর হাতে অর্থ কুক্ষিগত। আর বেকারত্ব ও দারিদ্র্যতায়, মূল্যবৃদ্ধির জাঁতাকলে পড়ে যখন সাধারণ মানুষ জেরবার তখন এ কেমন স্বাধীনতা। সমাজে ধনী দ্ররিদ্রের বৈষম্য নিত্য নতুন বেড়ে চলেছে। জাতি বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় সাধারণ মানুষ যখন ভীত সন্ত্রস্ত তখন এ কেমন স্বাধীনতা। দেশের মানুষ আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন তারা তাদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। আশাকরি তারা এবার প্রকৃত স্বাধীনতার সুখ ভোগ করতে পারবেন।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোণা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

ভিক্ষাবৃত্তিতে স্বাবলম্বী হওয়া যায় না

অনামিকা দে

মা লক্ষ্মী কি সত্যি খুশি হচ্ছেন? ভাবতে হবে। ভাণ্ডারে মাস গেলেই যে টুক করে ৫০০ টাকা পড়ছে তাতে গদগদ বাঙ্গালি নারী লাইন দিতে পিছপা নয়। পরিবারের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার ভাণ্ডারই এর লক্ষ্য। মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রী সচ্ছল, অসচ্ছল সব পরিবারকেই কৃপা করেছেন। কৃপা মানে দয়া করেছেন। এতে অবশ্য এক শ্রেণীর বাঙ্গালি সত্যিই খুব খুশি ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে দিদিকে মায়ের আসনেও বসিয়ে ফেলেছে। সমস্ত 'শ্রী' প্রকল্পের পর এবার 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের বুঝিয়ে দেওয়া যে তোমরা 'নারীজাতি', তোমাদের জন্য সরকার আলাদা করে ভাবনাচিন্তা করে। তোমরা আলাদা। তোমরা অসহায় তাই তোমরা আর্থিক সাহায্যদানের ওপর নির্ভরশীল। তোমরা যতই ক্ষমতায়নের আওয়াজ তোলো না কেন আসলে তোমরা স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী হতে পারবে কিনা, মা লক্ষ্মীর তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাই এই উদ্যোগ।

সরকারের এই উদ্যোগে বরাদ্দ টাকা ১২৯০০ কোটি। সুবিধাভোগীদের সংখ্যা ১.৬ কোটি। যদিও মমতাময়ী সরকার এখন আবার নতুন ঘোষণা করেছেন পরিবারের একাধিক মহিলাকে এই সুবিধা দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গেই সুবিধাভোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২.৬ কোটি আর বাজেটও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ থেকে ১৮ হাজার কোটি। আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর করাই নাকি এই প্রকল্পের লক্ষ্য। শুধু একটাই প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীকে, স্বনির্ভর কথাটির অর্থটা কি আপনাদের অভিধানে অন্য কিছু আছে? নাকি এখানে শব্দের অর্থকে বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে পূরণ করা হয়? পশ্চিমবঙ্গ তো ভারতেরই একটি রাজ্য, তবে কেন এই বৈষম্য? ভারত সরকার যখন আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলছে প্রতিটি রাজ্যে, তখন পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের এই ভিক্ষাদানের অর্থ কী?

মেরুদণ্ড সোজা করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর যে আনন্দ তা কি ভিক্ষার দানে আছে? যদি নারী ক্ষমতায়নের কথা ভাবতেই হয় তবে প্রকৃত অর্থে নারী শিক্ষা অভিযানে জোর দিন। মহিলাদের আত্মনির্ভর প্রকল্পে আর্থিক ঋণ প্রদান করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হতে সাহায্য করুন। কিছুদিন আগে একটি প্রবন্ধ পড়ছিলাম তাতে বর্ধমান জেলায় গ্রামের কিছু জনজাতি মহিলা এই করোনার লকডাউনের পরিস্থিতিতে হার্বাল হলুদের চাষ করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। জঙ্গলের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে নিজেরাই সেই জমিতে সোনার ফসল ফলিয়েছে। এই হার্বাল হলুদের চাহিদা প্রচুর, বিদেশের মাটিতেও। ভেবে দেখুন, বাঙ্গলার প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলারা তাদের কর্মদক্ষতায় আজও বিশ্বদরবারে নজির সৃষ্টি করছেন। উন্নতমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করার দিকে বরং নজর দিলে আমাদের রাজ্যের সার্বিক উন্নতি সম্ভব সেটা বলাই বাহুল্য। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ— এই ক্ষেত্রগুলিতে নজর দিতেই হবে।

সরকার থেকে কম খরচে বেশ কিছু কোর্স চালু আছে পশ্চিমবঙ্গে। এর সঙ্গে বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থাও এগিয়ে এসেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই সমস্ত সংস্থায় (সরকারি বা বেসরকারি) যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা প্রফেশনালি আপ টু দি মার্ক কিনা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় কম খরচে এই কোর্সগুলিতে স্টুডেন্টরা সেভাবে প্রফেশনালি ট্রেন্ড হয় না, যার ফলে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সেই সমস্যা থেকে যায়। সুতরাং সরকারি উদ্যোগে যদি স্বনির্ভর করতে হয় প্রথমে মহিলাদের সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সুরক্ষিত কর্মসংস্থান প্রয়োজন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কথা এক্ষেত্রে খুব প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন— 'অপর ব্যক্তির কোলে-পিঠে চড়ে এগিয়ে যাওয়ায় কোনো মাহাত্ম্য নেই। কারণ চলার শক্তিলাভই যথার্থ লাভ। এগিয়ে যাওয়া মাত্র লাভ নয়।'

রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে ২০২১-২২ সালের অর্থবর্ষের যে বাজেট পেশ করা হবে তাতে পশ্চিমবঙ্গে ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে ৫.৫৫ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২০-২১ সালের অর্থবর্ষের রিভাইজড এস্টিমেট অনুযায়ী জমা ঋণের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৮১ কোটি টাকা। অর্থাৎ একবছরে জমা ঋণের পরিমাণ বাড়ছে ১১ শতাংশ (এই সকল তথ্য ইটিভি ভারত ডট কমের ওয়েবসাইটে ৮ জুলাই ২০২১-এ প্রকাশিত আর্টিকেল থেকে সংগৃহীত)। এখন প্রশ্ন হলো, যে রাজ্যে প্রতিটি শিশু জন্ম নিচ্ছে মাথায় ঋণের বোঝা নিয়ে, সেখানে সরকারের এই 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' জাতীয় প্রকল্প আগামীদিনে ঠিক কোন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর যদি উন্নয়নের আড়ালে নিছকই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি থাকে তাহলে বলতে হবে এরাজ্যের মা-বোনেরা বিবেক বুদ্ধিহীন বাঙ্গালি হয়েই রয়ে গেছে, মানুষ হতে পারেনি। ▫

পুষ্টিগুণে ভরপুর আপেল

রিংকী ব্যানার্জী

আপেলে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, যা ক্ষতিকারক ফ্রি-র‍্যাডিক্যালগুলোকে শরীরের প্রবেশ করতে দেয় না। এই ফ্রি র‍্যাডিক্যালই বয়ে আনে নানা অসুখ বিসুখ। আপেল পরিফেনল আর্টারিতে রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। ফলে হার্টের সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে।

একদল ফরাসি গবেষক জানিয়েছেন, আপেলে রয়েছে ফ্লোরিডজিন নামে এক ধরনের ফ্যাভানয়েড। এই ফ্লোরিডজিন হাড়ের ঘনত্ব বাড়াতে সাহায্য করে। ফলের মধ্যে একমাত্র আপেলেই রয়েছে বোরন, যা হাড় মজবুত রাখে।

আয়রনের অন্যতম উৎস এই আপেল। শরীরে রক্তাল্পতা দেখা দিলে তাই চিকিৎসকরা আপেল খাওয়ার পরামর্শ দেন। আপেলে থাকা আয়রন রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ায়। দুর্বলতাও দূর করে অনেকটাই।

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা বলছে, যেসব শিশু রোজ আপেল খায়, তারা অ্যাজমার হাত থেকে রেহাই পায় অনেকটাই। গর্ভবতী মহিলারা রোজ আপেল খেলে তাঁদের সন্তানরাও অ্যাজমার শিকার হয় কম। কর্নওয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক জানান, অ্যালজাইমারের কারণ হতে পারে এমন ফ্রি-র‍্যাডিক্যালকেও ধ্বংস করে আপেলে থাকা কোয়েরসেটিন। পেকটিনের অন্যতম উৎস হলো আপেল। এই পেকটিন রক্তের খারাপ এল ডি এল-কে নিয়ন্ত্রণ করে। রোজ দুটো আপেল খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে ১৬ শতাংশ।

১০ হাজার মানুষের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, প্রতিদিন আপেল খেলে লাং ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা কমে ৫০ শতাংশ। আপেলে থাকা কোয়ারসেটিন ও নারিনজিন আর নারিনজিন ফ্ল্যাভানয়েডই-এর কারণ বলে জানান সমীক্ষকরা। সম্প্রতি কয়েকটি ইঁদুরের উপর সমীক্ষা চালিয়ে কর্নওয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখেছেন, প্রতিদিন একটা আপেল খেলে ব্রেস্ট ক্যানসারের সম্ভাবনা কমে ১৭ শতাংশ। প্রতিদিন তিনটি আপেল খেলে তা কমে ৩৯ শতাংশ। আর যদি ছ'টি আপেল প্রতিদিন খাওয়া যায়, তাহলে ব্রেস্ট ক্যানসারের সম্ভাবনা কমে ৪৪ শতাংশ। আপেলের খোসা কিন্তু কোলন ক্যানসার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার, যা হজম শক্তি বাড়িয়ে পরিপাকতন্ত্রকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। কনস্টিপেশনের হাত থেকেও রেহাই মেলে। নিয়মিত খোসা সমতে আপেল খেলে কোলন ক্যানসারের সম্ভাবনা কমে যায় ৪৩ শতাংশ।

এমনকী লিভার ক্যানসারকেও দূরে রাখে। লিভার ক্যানসারের আক্রমণ ঠেকানো যায় ৫৭ শতাংশ। আপেলের মধ্যে থাকা পেকটিন শরীরে গ্যালাকটুরোনিক অ্যাসিডের জোগান দেয়। এই অ্যাসিড শরীরে ইনসুলিনের চাহিদা কমায়। এতে রক্তে শর্করার মাত্রাও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। একটা ছোটো আপেলের পুষ্টিগুণ এক কাপ ফলের রসের সমান। আর আপেল খেলে পেটও ভরে অনেকটা। তাই ডায়েট করার সময় আপেল খেলে খিদে পাবে কম।

নিয়মিত আপেল খেলে কিন্তু দাঁত আর মাড়ি সুস্থ থাকে। আপেলে থাকা ফাইবার দাঁত পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। ক্যাভিটির সমস্যাও দূর করে। খাওয়ার পর আপেলের অ্যান্টি-ভাইরাল প্রপার্টি দাঁতকে ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাসের আক্রমণ থেকে বাঁচায়। আর আপেল কামড়ে খেলে স্যালাইভা ক্ষরণ বাড়ে। আপেলে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট চোখে ছানি পড়া অনেকটাই আটকায়।

আপেল বেটে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে মুখে মাখলে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। দাগ-ছোপও হালকা হয়ে যায়। সবার মাঝেও আপনার চেহারা নজর কাড়তে বাধ্য।

(লেখিকা একজন অপটিশিয়ান)

আর নয় গুগল-জুম, ফিরিয়ে দাও ক্লাসরুম

অনামিকা দে

আর নয় গুগল-জুম, ফিরিয়ে দাও আমাদের ক্লাসরুম। খুদেদের অসহায় মুখগুলো চেয়ে আছে কবে সেই চেনা বেঞ্চে বসে বন্ধুদের সঙ্গে খুনসুটি করতে করতে প্রিয় টিচারের ক্লাসে বসে সামনের বোর্ডে পড়া বুঝবে। প্রায় দু'বছর হলো ঘরের চারদেওয়ালে বন্দি মন হাঁপিয়ে উঠছে, সব সিলেবাস বুঝে নিতে হচ্ছে ছয় ইঞ্চির মোবাইলে অথবা ২১ ইঞ্চির ল্যাপটপে। একমাত্র ভরসা আধুনিক সফট্ওয়ারের অ্যাপস্। কিন্তু শৈশবের বিকাশ তো কুঁড়ি থেকে ফুল হওয়ার যাত্রা। সে যাত্রায় মুখ্য ভূমিকায় ছাত্রজীবনের স্কুল। আর সেই স্কুলই আজ বন্ধ। করোনা অতিমারিতে সাধারণ জীবনযাত্রায় সবই প্রায় স্বাভাবিক, শুধু কোপ পড়েছে খুদেদের ভবিষ্যতে। আজ সময় এসেছে, আমাদের সত্যি ভাবতে হবে— একটা গোটা প্রজন্মকে আমরা এ কোন অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। সমস্ত কোভিড প্রোটোকল মেনে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থাকে কি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না?

স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠের চতুর্থ শ্রেণীর ছোট্ট আরাত্রিকা। পড়াশুনো এখন মায়ের মোবাইলের হোয়াটস্অ্যাপেই সারতে হয় ওকে। 'ক্লাসের আন্টিরা মা'র হোয়াটস্অ্যাপে পড়া পাঠিয়ে দেন, আমি মা'র কাছে বসে হোমওয়ার্ক করে আন্টিদের পাঠিয়ে দিই। আন্টিরা সবাই খুব ভালো, আমায় ভালোবাসেন খুব। কতদিন হয়ে গেল আন্টিদেরকে দেখিনি। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা নেই, খেলতেও পারি না। মন খারাপ হয়।'

'কাগজ দিয়ে বল বানিয়ে পকেটে করে নিয়ে যেতাম লুকিয়ে, মা যেন টের না পায়। স্কুলের ওই বড়ো মাঠটার ক্রিকেট পিচে ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে আছি আর একটার পর একটা ছক্কা— এই ছিল তার রাত্তিরের বাধাধরা স্বপ্ন। প্রায় রোজই মায়ের কাছে বকুনি খেতাম ওই খেলারই জন্য। যদিও স্কুলে গেম স্যার খুব ভালোবাসতেন আমায়। আর বন্ধুরা তো উদ্দীপন বলতে পাগল।' উদ্দীপনের মুখে কথাগুলো শুনে বুঝতে পারলাম সেন্ট লরেন্স হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে পড়া উদ্দীপনের কাছে স্কুলের দিনগুলো এখন অতীত কাল। প্রায় সব বাক্যেই তার ছোঁয়া। অসম্ভব খেলা পাগল ছেলেটা কিন্তু পড়াশুনোতেও খুব ভালো। ওর বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম প্রায় প্রত্যেক বছরেই এক থেকে দশের মধ্যে থেকে ভালো রেজাল্ট করে উদ্দীপন। পড়াশুনোর পাশাপাশি ক্রিকেট ওর খুব পছন্দের। কিন্তু যেদিন থেকে স্কুল বন্ধ হলো করোনার জেরে সব অনুশাসন গেল শিকেয় উঠে। এখন পড়াশুনো আর খেলাধুলো সবই ওই ছয় ইঞ্চির স্ক্রিনের অ্যাপে বন্দি। মাঠে ক্রিকেট ব্যাটের বদলে এখন মোবাইল গেমে ফ্রি ফায়ারের বন্দুক হাতে ভার্চুয়ালি। অনলাইন ক্লাস হয় রেগুলার কিন্তু তাতে কি কৌতূহলী মনের সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তাই ভালো রেজাল্ট করার যে খিদে তাতেও যেন ভাটা পড়েছে।

হঠাৎ একদিন স্কুলে শুনলাম যে কাল থেকে লক্ডাউন, স্কুল বন্ধ। তার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই অবশ্য করোনার জন্য সব বন্ধ হতে পারে শুনেছিলাম। কিন্তু নির্দিষ্ট ওই দিনটায় (দিনটা ছিল সোমবার) সেদিন থেকে সত্যি বন্ধ হলো স্কুল। আমি ভাবতেই

পারিনি যে বন্ধুদের সঙ্গে, টিচারদের সঙ্গে, পুল কারের কাকুদের সঙ্গে আমার দুবছর ধরে আর দেখাই হবে না। আজও জানি না আবার কবে স্কুল ক্যাম্পাসে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে পারব। সাউথ পয়েন্টের ক্লাস এইটের ছাত্র অগ্নিদীপ্ত কথাগুলো বলতে বলতে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। স্বভাবে শান্ত অগ্নিদীপ্ত কিছুক্ষণ চুপ থেকে আরও বলল— 'আমার গুরু সংগীতাচার্য অমিয় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ক্লাসে আমি ছিলাম সবচেয়ে ছোটো। শনিবারের ক্লাসে সব দিদি দাদারা শিখতে আসতো, কতরকম রাগ শুনতাম, কত কিছু শিখতাম। ক্লাসের মাঝখানে গুরুজী কত কী গল্প করতেন। এখনও ক্লাস হয়, তবে অনলাইনে মোবাইলে, গুরুজীকে দেখতে পাই না, শুধু শুনি। সত্যি, ভালো লাগে না।' ওর বাবার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম অগ্নিদীপ্ত এখন খুব মোবাইলে আসক্ত হয়ে গেছে। শাস্ত্রীয় সংগীত শিখছে ছোটো থেকেই, যার ফলে যে কোনো বিষয়ে মনোযোগী। সকালে উঠে গান রেওয়াজ করে পড়াশুনো নিয়ে বসা— এই ছিল ওর প্রতিদিনের রুটিন। কিন্তু এখন অমনোযোগী হয়ে গেছে, অনলাইন ক্লাসগুলোও করতে চাইছে না ঠিক করে।

২০২০-২১-এর সমীক্ষায় উঠে এসেছিল চাঞ্চল্যকর তথ্য। দেশের ৩৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার মান এবং ফলাফলে এ রাজ্যের অবস্থান ৩৫, শিক্ষার সুযোগে ৩৩, পরিকাঠামোতে ৩৫-এ অবস্থান করছে, শিক্ষা সাম্যতে ৩১-এ। শিক্ষাতে আমার রাজ্য ঠিক যেন ক্লাসের সেই লাস্ট বেঞ্চার যার ইহকাল পরকাল ঢ্যারঢ্যার করছে। সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে— সত্যিই

নি:শব্দ ক্লাসরুম ফেলে অনলাইন অ্যাপসে মজে পড়ুয়ারা

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

শিক্ষা সমস্যা প্রবন্ধে রবিঠাকুর বলেছেন, 'শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময়ে প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য— ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়'। তবে কি রবিঠাকুরের কথাই বাঙ্গালি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে, তাই বেঞ্চি বোর্ডের থেকে মুখ ঘুরিয়ে এখন স্কুলে পড়াশোনা বাড়িতে বসেই; 'না-পরীক্ষার' করোনার বছরগুলোতে মফস্সল গ্রামের ছেলেপুলেরা গাছ আকাশ দেখে ড্যাং ড্যাং করে পাশ করল? কিন্তু এই ফাঁকির ফাঁকে যে গুটি গুটি করে শিক্ষায় অনুপ্রবেশ ঘটাতে চাইল তা হলো অনলাইন অ্যাপস। যে পাতালে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও সরকার অনুমোদিত স্কুলগুলো নামছে তাতে অ্যাপসই না শেষ রাস্তা হয়। কারণ সব মিলিয়ে সারা রাজ্যে ১ লক্ষ ১৬ হাজার শিক্ষকের শূন্য পদ! কে পড়াবে? একে করোনা লকডাউন, তার ওপর শিক্ষকের টানাটানি। স্কুল খোলার কথা উঠলেই রাজ্য সরকার মুখ ব্যাজার করে। এরই জাঁকিয়ে সুযোগ নিচ্ছে ঠিকানাহীন অনলাইন অ্যাপস। যাদের ওপর না আছে কোনো পর্যবেক্ষণ, না আছে কোনো নিয়ন্ত্রণ। দু' বছরের ওপর ছাত্ররা যে ব্ল্যাকবোর্ডটাই চোখে দেখছে না, বন্ধুর আঙুলে কলমের দাগ দিতে পারছে কোথায়! শেষ বিকল্প হিসেবে ওই যা একটু সময় যন্ত্রের মতো হয়ে অ্যাপে পড়াশোনা।

পশ্চিমবঙ্গে যেখানে সরকারি স্কুল থেকে দিকপাল সব মানুষরা তৈরি হয়েছিলেন তাতে আজ সংস্কৃতি জ্ঞান বিতরণের চেষ্টার পুনর্নবীকরণ হচ্ছে না। হচ্ছে না বলেই নিঃশব্দ ক্লাসরুম মাথানীচু করে অ্যাপসের কাছে আপোশ করেই চলেছে।

বিদ্যা এ রাজ্যে পুরো মুক্ত। না স্কুল খোলে, না শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ে। সরকারের এই উদাসীনতা নিম্নমেধাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং তাতে অনুঘটকের কাজে অবতীর্ণ নজরদারিবিহীন মানের অধঃপতনে প্রথম হওয়া শিক্ষা অ্যাপস। বিকাশভবন যতই দাবি করুক সব ঠিক আছে, কিন্তু তারা অস্বীকার করতে পারবে না, এই মুহূর্তে মালদায় শিক্ষক পড়ুয়া অনুপাত ১ : ৯৪ অর্থাৎ ১ জন শিক্ষক ৯৪ জন পড়ুয়াকে পড়ান। মুর্শিদাবাদে যা ১ : ৮১, বাঁকুড়ায় ১ : ৫৩, জলপাইগুড়ি ১ : ৯২, ঝাড়গ্রাম ১ : ৮৮, নদীয়া ১ : ৭৫। অথচ করোনা কালে পাশ করে যাওয়ার হার ১০০ শতাংশ! এও কি কম সমস্যা? এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলেন ১২ লক্ষ ৫০ হাজার। তারমধ্যে ৯ লক্ষ ৯৬ হাজার নিয়মিত পরীক্ষার্থী। রাজ্যে তো মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১০ হাজার। মাদ্রাসা মিলিয়ে সেই সংখ্যা ১২ হাজার। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সেখানে ৭ হাজার। প্রত্যেক স্কুলে যদি খাতায় কলমে গড়ে ২৭৫ জনও ভর্তি হন তাহলেও তো প্রায় ৩ লক্ষ পড়ুয়া ভর্তি থেকে বাদ থাকবেন।

এই তো মওকা অ্যাপসের। এবার গাদাগাদি করে এই শিক্ষাবর্ষে যদি সবাইকে ভর্তি করা যায়, কারণ স্কুল তো খুলছে না, তাহলে দেখেও না দেখার ভান করে অ্যাপস নির্ভর পড়াশোনা ওরা করুক এবং শিক্ষায় শেষের দিক থেকে প্রথম হওয়ার রাস্তাটা তৈরি থাক। রাজ্যের সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো এবং শিক্ষার মানের ভগ্ন দশার ফলে স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ছে। একটুও অতিরঞ্জিত করছি না, খোদ কলকাতার বুকেই শিল্পকলা মন্দিরে পড়ুয়া সংখ্যা মাত্র ২৬, পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইন্সটিটিউশনে যা ১৪, সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে মাত্র ২৫ জন পড়ুয়া। শিক্ষকের অভাব এবং চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের বৈষম্যের অভিমান সব মিলিয়ে দেদার বিঘ্নিত রাজ্যের সরকারি এবং সরকার অনুমোদিত বাংলা মাধ্যমের স্কুল।

কেবলমাত্র পরিকাঠামোর অভাব বলেই এই প্রতিকূল করোনা পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ উত্তরপ্রদেশের মতো 'মিশন প্রেরণা কীই- পাঠশালা'র মতো কোনো অনলাইন মডেল আনতে পারল না। যার ফলে অনভিপ্রেত অ্যাপস ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে এবং ভুল বিদ্যার বোঝা চাপাচ্ছে পড়ুয়াদের মাথায়। সরকারি স্কুলের শিক্ষকরাও দায়বদ্ধতার দায় এড়াচ্ছেন। আগে যেটা গৃহশিক্ষক নির্ভরতা ছিল সেটাও একটু একটু করে অ্যাপস গ্রাস করছে। এরমধ্যে আরও এক বিপত্তি উৎসশ্রী প্রকল্প। গ্রামের স্কুলগুলো ফাঁকা থাকছে, তালাবন্ধ প্রাঙ্গণ, কারণ শিক্ষকরা বদলি নিয়ে চলে আসছেন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া কী তা আমরা সবাই ভুলে গিয়েছি। ১৪ ডিসেম্বর রাজ্যে এক লজ্জার অধ্যায় সংযুক্ত হলো, উদ্বোধনের আগেই সাবেক ছিটমহল ফলনাপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়-সহ উত্তরবঙ্গের মোট ১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ করল রাজ্য সরকার। সারা রাজ্যে এমন স্কুলের সংখ্যা

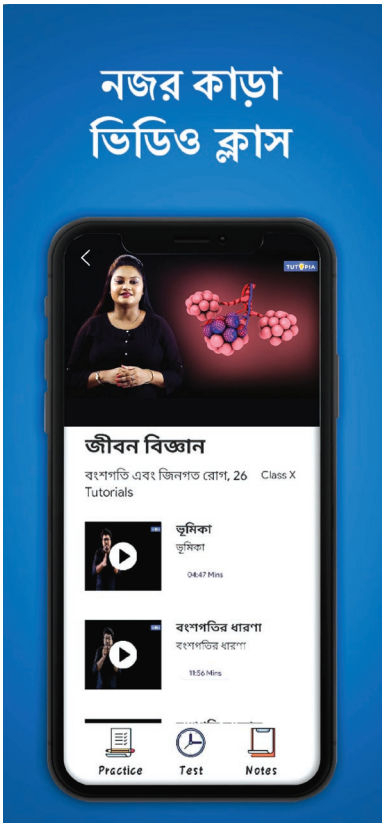

২০৩টি। সব স্কুল যে পড়ুয়াবিহীন। সরকারি স্কুলের পড়ুয়ারা শিক্ষকের কথা কি তবে শোনার অভ্যাস হারাবে আর মোবাইলে আবোলতাবোল যা যন্ত্রণার পড়াশোনা তাই চলবে?

দিনের পর দিন শিক্ষার মান এবং ব্যয় সংকোচন কি তবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাঙ্গনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেনস-এর আমন্ত্রণ জানাবে? ঠিক যে মুহূর্তে নিবন্ধ লিখছি, তখনই খোঁজ পেলাম, শিক্ষার হারের নিরিখে এগিয়ে থাকা পূর্ব মেদিনীপুরের দাউদপুর, কাঁথির ব্রাহ্মণচক জুনিয়র হাই স্কুলস, এগরা, নন্দীগ্রাম, খেজুরি, ময়না এবং ভগবানপুর ব্লকের একটি করে জুনিয়র হাই স্কুল ছাত্রের অভাবে বন্ধ হলো। সরকারি স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা কমছে, শিক্ষক নিয়োগ নেই, পরিকাঠামোয় জীর্ণতার চূড়ান্ত, করোনা লকডাউনের ফাঁকে অ্যাপ নির্ভর লেখাপড়া যেন কফিনের শেষ পেরেক। এ কেমন শিক্ষাপ্রাঙ্গণ যা আমাদের যেতে বাধা দেয়। দায় সারতে শেখায়। আইনস্টাইন ১৫ অক্টোবর ১৯৩৬-এ শিক্ষা বিষয়ে যে জগৎ কাঁপানো চিঠি লিখেছিলেন তাতে বলেন— this knowledge must continually be renewed by ceaseless effort, if it is not to be lost— এবং বলেন এই পদ্ধতিতে চললে স্কুলগুলি মৃত হয়ে যাবে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ যেখানে সরকারি স্কুল থেকে দিকপাল সব মানুষরা তৈরি হয়েছিলেন তাতে আজ সংস্কৃতি জ্ঞান বিতরণের চেষ্টার পুনর্নবীকরণ হচ্ছে না। হচ্ছে না বলেই নিঃশব্দ ক্লাসরুম মাথানীচু করে অ্যাপসের কাছে আপোশ করেই চলেছে। ■

করোনাকে সামনে রেখে বেসরকারি হাসপাতালগুলি রক্তচোষার ভূমিকায়

বিশ্বপ্রিয় দাস

করোনা অতিমারিকে সামনে রেখে একদল রক্তচোষা বাদুড় সাধারণ মানুষকে রক্তহীন করার নেশায় বুঁদ হয়ে নিজেদের পকেট ভরানোর খেলায় মত্ত হইছে। দীর্ঘ প্রায় দু' বছর ধরে এই খেলা চলছে। দিশেহারা সাধারণ মানুষ এই রক্তচোষাদের জালে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে নিজেদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। আর সেই হারিয়ে যাবার পর যখন তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে ওইসব রক্তচোষা বাদুড়ের কাছে যাওয়াটাই ছিল বেঠিক, তখন অবশ্য অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে।

সারা বিশ্বে করোনা অতিমারিকে সামলাবার জন্য একটি গাইড লাইন বেঁধে দিয়েছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তাদের সেই গাইড লাইনে লেখা ছিল, কীভাবে কোভিডকে প্রতিরোধ করতে হবে। ২০২০ সালের একেবারে করোনার শুরুর সময়ে সরকারি হাসপাতালে এই পরিস্থিতি সামলাবার মতো পরিকাঠামোর অভাব যথেষ্টই ছিল। ফলে অসহায় হয়ে পড়েছিল সাধারণ মানুষ। দিশেহারা হয়ে একটু চিকিৎসা পাবার আশায় ছুটে বেড়াচ্ছিল একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়েছিল চারিদিকে। যদিও শুরুর মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে মানুষ যে হারে আক্রান্ত হচ্ছিলেন, সেই সংখ্যার থেকে একটু বেশিই শয্যা সংখ্যা থাকলেও (একটি পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যে জনসংখ্যা প্রায় ১০.১৯ কোটির মতো) সেখানে সরকারি হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা ৭৮৫৬৬টি। ফলে এই অতিমারিতে সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এখানে লক্ষ্য করা গেছে সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা দেবার দিক দিয়ে একেবারে নীচের সারিতে ছিল পশ্চিমবঙ্গ। বিশেষ করে করোনা অতিমারিকে সামলাবার বিষয়ে। করোনা অতিমারির শুরুর সময়ে, ভাইরাসের ভয়ংকর রূপ দেখে বেসরকারি হাসপাতালগুলি অনেকটাই পিছিয়ে গিয়েছিল। কারণ ছিল সংক্রমণের ভয়। পরে যখন তারা দেখল যে এই করোনা ভালো ব্যবসা দেবে, ঠিক তখনই নখ আর দাঁত বের

পরিষেবার টানেই আজ

জাহ্নবী রায়

করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা নিয়ে নানা ঢক্কানিনাদ রাজ্যের সরকারের। তা সত্ত্বেও কেন সরকারি হাসপাতাল ছেড়ে আক্রান্ত রোগীরা বেসরকারি হাসপাতালে ছুটেই চলেছে, তাঁর কারণ নিয়ে অনেক কথাই হচ্ছে। সেই শুরুর দিন থেকেই সরকারের কাজের সঙ্গে কথার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাস্তবের সঙ্গে মেলেনি সরকারের দেওয়া তথ্য। ২০২০ সালের ১০ জুলাই, দিনটা ছিল শুক্রবার। এক তরতাজা তরুণের চিরতরে চলে যাওয়াকে কেন্দ্র করে ঝড় উঠেছিল রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে। এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ঘুরে মৃত্যু হয়েছিল ইছাপুরের তরুণ শুভ্রজিতের। কোমর্বিডিটি ছিল ওই তরুণের। সামান্য চিকিৎসার সুযোগ পেলে হয়তো বেঁচে যেত সে। সেই সময়ে দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে করোনা রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট বেডের মধ্যে মাত্র ২৭ শতাংশ বেডে রোগী ভর্তি আছেন। তা সত্ত্বেও সারা রাত এক হাসপাতাল থেকে আর এক হাসপাতালে ঘুরে মৃত্যু হয়েছিল করোনা আক্রান্ত ওই তরুণের। পরিবারের অভিযোগ, এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে ছুটতে ছুটতেই ছেলেটা মরে গেল। অজপাড়াগাঁ নয়, ঘটনাটি ঘটেছিল খাস কলকাতার সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার আওতায়। যার পর করোনা চিকিৎসা নিয়ে সরকারের দাবি ও বাস্তবতার মধ্যে কতটা অমিল সেই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধীরা।

পরিবারের আরও অভিযোগ, ওই তরুণকে মেডিক্যাল কলেজের ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার

করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্যবসা করতে।

সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থায় এমনিতেই আস্থা হারিয়েছে সাধারণ মানুষ। তার ওপর রাজ্যে কোভিড হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা করে করোনা মুক্ত হবার ঘটনা আশাব্যঞ্জক না দেখে, মানুষ পাগলের মতো দৌড় শুরু করলেন বেসরকারি হাসপাতালে। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা লোটায় নেমে পড়ল বেসরকারি হাসপাতাল।

কলকাতার সরকারি হাসপাতালের, বিশেষ করে কলকাতার বুকে থাকা কয়েকটি করোনা হাসপাতালের কয়েকজন করোনা যোদ্ধা চিকিৎসকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল এই বিষয়ে। তাঁদের অনুরোধে নাম দেওয়া সম্ভব হলো না। তাঁদের মতে, করোনা চিকিৎসায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মাত্র দুটি ওষুধের ব্যবহার সাজেস্ট করেছিল। সেগুলির দাম যৎসামান্য। তাই দিয়ে বর্তমানে চিকিৎসা চলছে। খুব সামান্য দাম সেগুলির। আর যাঁরা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ নিয়েছেন, তাঁরা সেই ওষুধে সংকট মুক্তির পথ পেয়েছেন। অন্যদিকে যাঁরা সরকারি হাসপাতালের সুযোগ নিতে ভরসা পাননি, তাঁরাই দৌড়েছেন বেসরকারি হাসপাতালে। ওই চিকিৎসকদের মতে, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পরিষেবার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা বিল করেছে বেসরকারি হাসপাতালগুলি। আর সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রিয়জনকে বাঁচাবার জন্য জোগাড় করার চেষ্টা করেছেন সেই টাকা।

বেসরকারি হাসপাতালগুলি রক্তের নানা পরীক্ষা, বেড ভাড়া, এমনকী প্রতিদিন পিপিই কিট পর্যন্ত আদায় করে নিয়েছে রোগীর পরিজনদের কাছ থেকে। একজন রোগীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী চিকিৎসার খরচ করোনা পজিটিভ রোগীর ক্ষেত্রে প্রায় ১৫০০ থেকে ১৭০০ গুণ হয়ে দেখা দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

২০২০ সালের মার্চ মাসে রাজ্যের নামকরা সমস্ত বেসরকারি হাসপাতালের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসে সরকার। অনুরোধ জানানো হয় যে, করোনা রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিছু ছাড়ের ব্যবস্থা করুক হাসপাতালগুলি। এটা যখন কাজে এল না, তখন প্রায় নির্দেশ আকারে এল, বেশি টাকা নেওয়া চলবে না। সেটাও কাজে আসেনি। বেসরকারি হাসপাতালের চরিত্র একটুও বদলায়নি। তাঁরা সাপ মরবে অথচ লাঠিও ভাঙবে না, এরকম একটি পথ ঠিক করে নেয়। নানা গিমিক পদ্ধতিতে করোনা চিকিৎসায় সুরাহার কথা তাঁরা বলতে শুরু করেন। আর শুরু হয় নানা চিকিৎসা সংক্রান্ত প্যাকেজের বিষয়। অর্থাৎ রক্তচোষার নানা ফন্দি ফিকির মানুষের কাছে নিয়ে আসে স্বাস্থ্য নিয়ে যারা ব্যবসা করছেন তাঁরা। প্রকৃত অর্থে দেখা যায় যে করোনা আদতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে একটি টাকা তৈরির যন্ত্রে পরিণত। ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিস্টমেন্ট কমিশন বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে অনুরোধ করে

মানুষ বেসরকারি হাসপাতালমুখী

জন্য হাসপাতালের কোনও কর্মীকে পাওয়া যায়নি। করোনা আক্রান্ত যুবককে করোনা ওয়ার্ডে পৌঁছে দেন পরিজনরাই। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে, ধকল আর নিতে পারেনি শরীর। শুক্রবার রাতেই মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হয় শুভ্রজিতের। আরও ভয়ংকর চিত্র সেদিন দেখা গিয়েছিল। করোনা রিপোর্ট হাতে না আসায় তরুণের মৃতদেহ দেওয়া নিয়ে টালবাহানা করেছিল হাসপাতাল। এবছরের শুরুতেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের করোনা বিভাগে ঘটল আর এক মর্মান্তিক ঘটনা। ওই বিভাগে আগুন লেগে দগ্ধ হয়ে মারা গেলেন এক রোগিণী। প্রশ্ন উঠছে রোগীর নিরাপত্তা নিয়েও। মৃত সন্ধ্যা মণ্ডল (৬০) বর্ধমানে গলসির বড়মুড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ২৯ জানুয়ারি ভোররাতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের করোনা ওয়ার্ডে আগুন লাগে। একজন রোগী প্রথমে আগুন দেখতে পান। তিনি বাকিদের ঘুম ভাঙান। পরে হাসপাতালের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ততক্ষণে গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন সন্ধ্যাদেবী। আর মৃত্যুও ঘটল তাঁর।

মানুষের মনে কেন সরকারি হাসপাতালে যেতে অনীহা? উত্তর আসে, রোগীকে ভর্তি করার পর আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এমনকী মৃত্যু হলেও সেই সংবাদ পরিজনদের কাছে অতিমারি শুরুর সময়ে পৌঁছতে সময় লাগত তিনদিন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে মৃতদেহ সৎকার হয়ে যাবার অনেক পরে খবর পেয়েছেন পরিজনেরা। ফলে মানুষ আর সরকারি হাসপাতাল চত্বর মাড়াতেই চাননি। এই সরকারি পরিষেবার খামতির জন্যই বেসরকারি হাসপাতালের বাড়বাড়ন্ত। যেখানে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। □

বেড ভাড়ার ক্ষেত্রে সামান্য ছাড় দিতে। সেই সময়ে ভয়ংকর রূপ নেয়নি করোনা। সেসময় আরও বলা হয়, যদি কোনো করোনা রোগী হাসপাতালে আসেন, ভর্তির সময়ে তাঁদের কাছে ডিপোজিট করার মতো অর্থ না থাকলেও ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না রোগীকে। এর সঙ্গে দিতে হবে মেডিসিনে ছাড়। সেটিও মানা হয়নি। এমনকী দেখা গিয়েছে এসবের বিরুদ্ধে গিয়ে মামলা করতে। আবার দেখা গেছে রোগীকে ভর্তির সময়ে দেয় টাকার পরিমাণ ৫০ হাজারে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জোগাড় করে জমা না দিতে পারলে রোগীকে স্থানান্তর করতে বাধ্য হবে বেসরকারি হাসপাতাল। সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে উঠে এসেছিল এ খবর।

রোগীর ক্ষমতা বা অক্ষমতা বিবেচ্য হয়নি কোনো ক্ষেত্রেই। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার, দেওয়া হয়েছিল মাত্র ২৪ ঘণ্টা। এখানে কোভিডকে সামলে মুনাফা লুটা মুখ্য। সেখানে রক্তচোষাদের চিকিৎসার নামে ডাকাতি করাটা প্রাধান্য পেয়েছে বারে বারে। বেশ কিছু বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারা গেছে, বেসরকারি হাসপাতালগুলি তো আর জনসেবা করার দায় নিয়ে ব্যবসা করতে বসেনি। তারা এসেছে মুনাফা করতে, তাই এই সুযোগ কেন হাতছাড়া করবে। আর রোগীর পরিজনেরা বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা পাবার জন্য আসার আগে খরচের বিষয়টি জেনেই আসেন। তাই তাদের কাছে হঠাৎ অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে— এমনটা ভাবা ঠিক নয়। যুক্তির জালে আটকে যায় সদুত্তর। এদিকে আমাদের রাজ্যের সরকারের চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যর্থতার চিত্রটি যাতে আরও প্রকট না হয় তার জন্য একটা পরিকল্পনা করা হলো। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করে তার মাথায় বসানো হলো বাইপাশের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালের এক চিকিৎসককে। প্রসঙ্গত, এখন একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে, নেতা থেকে আমলা, সবাই চিকিৎসা করাতে ছোটেন বেসরকারি হাসপাতালে। রাজ্যের যুবরাজ যেমন আছেন সেই তালিকায়, তেমনি

বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে অত্যাধুনিক যে যান্ত্রিক চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যায়, সেই চিকিৎসা পরিষেবা কেন রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে পাওয়া সম্ভব নয়? তাহলে কি সরকারি মদতেই এই করোনাকে কেন্দ্র করে বেসরকারি রক্তচোষাদের বাড়বাড়ন্ত? নাকি সরকারি ব্যর্থতার কারণেই এই রক্তচোষাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে?

আছেন মন্ত্রীরাও। এই প্রসঙ্গে আরও একটি সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করতেই হয়। গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে অসুস্থতার জন্য প্রথমে নিয়ে যাওয়া হলো এসএসকেএমে। রাজ্যের অন্যতম সরকারি এলিট হাসপাতালে। এমনই এলিট যে করোনা ধরা পড়তেই ভালো চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো বাইপাশের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তদারকি করে এই ঘটনা ঘটালেন, সেটি সংবাদমাধ্যম মারফত রাজ্যের আপামর জনগণ দেখলেন। যেমনটি দেখেছিলেন যুবরাজের চোখের একটি সমস্যার সময় বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাবার ব্যাপারটি। আর এইসব কারণে সাধারণ মানুষের মন থেকেই সরকারি পরিষেবার প্রতি একটি অনীহার জন্ম দিয়েছে।

এবার আসা যাক অন্য একটি প্রসঙ্গে। করোনার চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা গিমিক বেসরকারি হাসপাতাল মানুষের সামনে আনছে, থেরাপির নামে সেইসব কায়দা রোগীর কতটা কাজে লাগছে বলা শক্ত। তবে গালভরা সেই সব থেরাপি নামক চিকিৎসার সাহায্য নিতে অসহায় মানুষ দৌড়চ্ছেন ওইসব বেসরকারি হাসপাতালে।

দুর্জনেরা বলছেন, বেসরকারি হাসপাতালগুলি নানা চিকিৎসার জন্য ওষুধ থেকে পরিষেবা— সবেতেই গলাকাটা একটি মূল্য ঠিক করে রেখেছেন। আর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য যৎকিঞ্চিৎ একটি ডিসকাউন্ট তাঁরা দিচ্ছেন। সরকারি অনুরোধও রক্ষা হলো আর অন্যদিকে রোগীর গলা কাটাও হলো।

করোনার ভ্যাকসিন নিয়েও নানা হাসপাতাল নানা ভাবে মূল্য নিচ্ছে। কোনো সরকারি নিয়ম নীতি নেই। আবার করোনা হয়েছে কিনা জানার ক্ষেত্রেও ঘটছে একই অবস্থা। রাজ্যের বেসরকারি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নেই একেবারেই নিয়ন্ত্রণ। ফলে বেসরকারি হাসপাতাল যে রকমভাবে পারে করোনাকে সামনে রেখে রোগীকে লুটে নিচ্ছে। এমনটাই ভাবছেন সাধারণ মানুষ থেকে চিকিৎসক মহল। আর এর পিছনে থাকা রাজনৈতিক ছত্রছায়া থাকার কারণে, শাস্তি তো দূরের কথা, সামান্য কঠোর নিয়মের বাঁধনেও বাঁধা যাচ্ছে না এই রক্তচোষা বেসরকারি চিকিৎসা ক্ষেত্রকে।

সব শেষে একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে, বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে অত্যাধুনিক যে যান্ত্রিক চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যায়, সেই চিকিৎসা পরিষেবা কেন রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে পাওয়া সম্ভব নয়? তাহলে কি সরকারি মদতেই এই করোনাকে কেন্দ্র করে বেসরকারি রক্তচোষাদের বাড়বাড়ন্ত? নাকি সরকারি ব্যর্থতার কারণেই এই রক্তচোষাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে? পুরোটাই হয়তো সম্পৃক্ত একে অপরের সঙ্গে। □

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে লোকপ্রজ্ঞার অনুভব দর্শন অনুষ্ঠান

অখিল ভারতীয় প্রবুদ্ধ মঞ্চ প্রজ্ঞাপ্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞার অনুভব দর্শন অনুষ্ঠিত হয় গত ২ জানুয়ারি কলকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রথীন্দ্র মঞ্চে। এই কার্যশালার মাধ্যমে সেদিন স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালিত হয়। মুখ্য বক্তা হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন প্রজ্ঞাপ্রবাহের অখিল ভারতীয় সংযোজক জে নন্দকুমার। তিনি বলেন, 'ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি হলো তীর্থক্ষেত্র। কারণ সেখানে জগতের কল্যাণের চিন্তন হয়েছিল। স্বাধীনতা অমৃতমহোৎসব পালনের সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এটি কেবল শতবর্ষের দিকে পথ চলা নয়, এর জন্য কয়েক শত বছর ধরে দেশবাসী সাধনা করে চলেছেন। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও বন্দেমাতরম্ বিশেষ একটা শোনা যেত না, কিন্তু এখন দেশের বেশিরভাগ স্থানে তা শোনা যাচ্ছে। স্বাধীনতা হলো যে কোনো বড়ো কাজের প্রেরণা। আজ আমরা আত্মনির্ভর ভারতের দিকে চলেছি। পৃথিবীর বহু দেশ এক সময় পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, দীর্ঘ সংগ্রামের পর তারাও স্বাধীন দেশের মর্যাদা পেয়েছে। ওই সমস্ত দেশের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হলো আমাদের লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতা। আমরা 'স্ব' উপলব্ধি করার পথে চলেছি। সেজন্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল আধ্যাত্মিকতা। এই লক্ষ্য প্রদান করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ। তাঁদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজার হাজার দেশবাসী দেশের জন্য সর্বস্ব সমর্পণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বহু জনের নামও আমরা জানি না।' তিনি স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে নিজেদের 'স্ব'কে জাগ্রত করার আহ্বান জানান। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বতন উপাচার্য তথা রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির কার্যকরী অধ্যক্ষ ড. সুজিত কুমার বসু অনলাইন বক্তব্যে ভারতের নবজাগরণে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা বিশদে উল্লেখ করেন।

লেখক অর্ণব নাগ ভারতের নবজাগরণে হিন্দুমেলার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, হিন্দুমেলায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ এই উপলক্ষ্যে মাতৃশক্তির ভূমিকার বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ও কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের অ্যাডভোকেট অজয় কুমার নন্দী, পূর্বক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ বলরাম দাশরায়, বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী, ক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের প্রধান ড. শকুন্তলা মিশ্র, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. রাসবিহারী ভড়, অধ্যাপক রামেশ্বর মিশ্র, ড. দিলীপ কুমার মিশ্র, ড. সোমশুভ্র গুপ্ত, ড. আনন্দ পাণ্ডে, প্রজ্ঞাপ্রবাহের ক্ষেত্রীয় সংযোজক অরবিন্দ দাশ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে গীত পরিবেশন করেন সঙ্ঘমিত্রা মিশ্র ও দুর্গা চক্রবর্তী। উল্লেখনীয় যোগদানের জন্য ছাত্রীদের শংসাপত্র ও উপহার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমতী পারমিতা গুপ্ত ও দেবাশিস ঘোষ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন লোকপ্রজ্ঞার রাজ্য গবেষণা প্রমুখ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার। অনুষ্ঠানে ৪০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

কোচবিহারে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের কর্তব্যবোধ দিবস উদ্‌যাপন

কোচবিহার জেলা বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৬ জানুয়ারি কর্তব্যবোধ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হসপিটালের নার্স লিলি সরকার ও কেকা বিশ্বাসকে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এই দুজন নার্স বিগত দু'বছর ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এই অনুষ্ঠানের পর জেলার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মানস করকে জেলার শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ৬০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরার সেবাধামে গণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

৭৩ তম গণতন্ত্র দিবসের পুণ্যলগ্নে ত্রিপুরা রাজ্যের খয়েরপুরস্থিত সেবাধামে এক বিশেষ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। সমস্ত রকম করোনা বিধি মেনে সকাল আটটায় জাতীয় সংগীত গাওয়ার পর পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক গণতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য সকলের সকলের সামনে তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাচীন ভারতের গণরাজ্যিক পদ্ধতির উল্লেখ করে বলেন, তখন প্রকৃত অর্থেই মানুষের মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা জনগণের রাজত্ব প্রতিফলিত হতো। বর্তমানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও সেই মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারাই পুষ্ট করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাচীন গণরাজ্য বৈশালী ও লিচ্ছবির কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, গণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন একট ভাবনা, যে ভাবের উদয় হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে। জাতীয় পতাকার উপরের যে গৈরিক রং, তার আবহেই প্রাচীন ভারত থেকে নব ভারতের সংস্কৃতি রচিত বয়েছে। গৈরিক রং শাশ্বত ভারতের পরিচয় যা ত্যাগ ও শৌর্য-বীর্যের প্রতীক। সাদা রং শান্তির বার্তবাহক, যে শান্তির বার্তা ভারতের আত্মা থেকে উৎসারিত। ভারত সারা বিশ্বকে যুগ যুগ ধরে শান্তির বন্ধনে বাঁধার চেষ্টা করে চলেছে। সবুজ রং প্রগতি তথা মা লক্ষ্মীর প্রতীক। ভারত প্রকৃতিবান্ধব একটি দেশ। সবুজ বা প্রকৃতিকে ধ্বংস করে নয়, ভারতের লক্ষ্য সবুজ বনানী তথা প্রকৃতিকে রক্ষা করে প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া। এগিয়ে যাওয়া মানে শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সামগ্রিক। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হবে। এটাই ভারতের ধর্ম। ভারতের ধর্মীয় মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছে জাতীয় পতাকার মাঝখানে অবস্থিত অশোকচক্রের মাধ্যমে। পতাকার সমস্ত রঙের এই প্রতীকী ব্যবহার আমাদের জীবনের দ্বারা রূপায়িত করে সারা দেশে প্রকৃত গণরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের সংকল্প।

স্বস্তিকার 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব' বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান

জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার ২৪ জানুয়ারি সংখ্যাটি 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব' বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে। জেলায় জেলায় সাড়ম্বরে সংখ্যাটির প্রকাশ অনুষ্ঠান চলছে। উত্তর-পূর্ব কলকাতার কালিন্দীতে প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকার প্রকাশক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, উত্তর-পূর্ব ভাগ সঙ্ঘচালক রামকৃষ্ণ পাল, মাধবনগর সঙ্ঘচালক মহেশ মোদী ও পূর্ব বিভাগ বৌদ্ধিক প্রমুখ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী। স্বস্তিকার প্রকাশক শ্রীপাল বলেন, ৭৪ বছর ধরে স্বস্তিকা পত্রিকা বাঙ্গালি পাঠকদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর নগরের মাধব ভবনে এক মনোগ্রাহী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বস্তিকার বিশেষ সংখ্যার উন্মোচন হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র কার্যকারিণীর সদস্য বুদ্ধদেব মণ্ডল। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. গৌতম ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা সঙ্ঘচালক গিরিধারী ঘোষ, বহরমপুর নগর সঙ্ঘচালক অমিত চৌধুরী।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী, প্রান্ত অধিকারী প্রফুল্ল ঘোষ, পঙ্কজ মণ্ডল, সুশোভন মুখার্জি প্রমুখ। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন মন্দার গোস্বামী। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন ড. ভৌমিক।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার গৌড়ীয় মঠে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে স্বস্তিকা বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ হয়। বিশেষ সংখ্যার আবরণ উন্মোচন করেন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী দিলীপ ভৌমিক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পঙ্কজ কুমার নিয়োগী, অধ্যপক নারায়ণ গুছাইত, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিশ্বনাথ বৈদ্য এবং স্বাধীনতা ৭৫ উদ্‌যাপন সমিতির জেলা সম্পাদক পার্থ হালদার।

দক্ষিণ কলকাতার বাঘাযতীন ভাগের প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভাগ সঙ্ঘচালক সীতেশ ভট্টাচার্য ও বিভাগের সহ কার্যবাহ শুভ্রজিৎ ব্যানার্জ।

উত্তরবঙ্গের মালদা নগরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কার্যালয়ে স্বস্তিকার প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মালদা সমাচার পত্রিকার সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক সঞ্জীব চক্রবর্তী। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ সহ প্রান্ত কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রতিনিধি পরেশ চন্দ্র সরকার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশিষ্ট শিক্ষক তথা প্রবীণ স্বয়ংসেবক অলোক কুমার দাস।

বালুরঘাট নগরের প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সঙ্ঘচালক অরুণ কুমার মহন্ত ও নগর সঙ্ঘচালক বিমলেন্দু দাস। রায়গঞ্জ নগরের প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থত ছিলেন প্রান্ত সঙ্ঘচালক ঋষিকেশ সাহা ও উত্তর দিনাজপুর জেলা সঙ্ঘচালক অপূর্ব কুমার দাস।

রাজগিরের গুহা রহস্য ও সিদ্ধনাথ শিব

দেবাশিস চৌধুরী

গা ছমছমে গুহার মধ্যে শুধুই গাঢ় অন্ধকার। মোবাইলের টর্চটা জ্বালাতে অন্ধকার কিছুটা দূর হলো ঠিকই, তবে নিজেদের ছায়াগুলিকে কেমন যেন অদ্ভুতুড়ে মনে হচ্ছে। মামমাম গুহার মধ্যে প্রবেশ পথের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎই লক্ষ্য করলাম ও দুটো হয়ে গেছে! অবাক হয়ে ওর দিকে গাইডের দিষ্টি আকর্ষণ করাতে মৃদু হেসে হিন্দিতে যা বললেন তার ভাবার্থ হচ্ছে, 'স্যার, ছোটো ম্যাডামকে দেখে অবাক হবেন না। এই হচ্ছে সেই সুপ্রাচীন মৌর্যযুগের অত্যাশ্চর্য পালিশের কেরামতি, যা দেখতে আপনারা আজ এসেছেন। শুধু আপনারাই নন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে এই পালিশের ভেলকি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম স্বয়ং'।

হয়েছে কী, এবারের পারিবারিক ট্যুরে আমাদের গন্তব্য ছিল রাজগির। ট্যুর-পোগ্রাম করার সময় গুগুল ম্যাপ ঘাঁটতে ঘাঁটতে বারাবার ও নাগার্জুন টিলার সন্ধান পেতেই পায়ের তলার সর্ষেটা নড়ে উঠল। ভাবলাম রাজগির থেকে গাড়ি রিজার্ভ করে এসে দিনের দিন বেড়িয়ে ফিরে গেলে মন্দ হয় না।

ইতিহাস বলছে এই জায়গায়, অর্থাৎ এই বারাবার ও নাগার্জুন টিলায় যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় আড়াইশো বছর আগে মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ছিল আজীবিক সম্প্রদায়ের সাধনস্থল। জৈন- বৌদ্ধদের সমসাময়িক বিলুপ্ত আজীবিক গোষ্ঠীর আজ অবধি কোনো ধর্মগ্রন্থ পাওয়া না গেলেও এটুকু জানা যায়, তাঁরাও ছিলেন জৈন-বৌদ্ধদের মতোই বেদ বিরোধী। এই গোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ মঙ্খলিপুত্র গোসালের নেতিবাদী দর্শনে কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সম্রাট অশোকের শিলালিপি থেকেই প্রথম জানা যায় তাঁদের একদা এই সাধনভূমির কথা।

ইতিহাসের টানে রাজগির থেকে সকাল আটটা নাগাদ বেরিয়ে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এখানে পৌঁছে গেলাম। গাড়ি থেকে বারাবার টিলায় ওঠার রাস্তার সামনে নামতেই পাশের মিউজিয়ম থেকে গাইড এগিয়ে এলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে চললাম দু' কিলোমিটার দূরের নাগার্জুন টিলায়। যেতে যেতে তাঁর মুখে শুনতে থাকলাম ইতিহাসের অজানা কথা।

ভারতের ইতিহাসে কৃত্রিম বা মানুষের হাতে বানানো গ্রানাইট পাথরের গুহাগুলির মধ্যে এই অঞ্চলের গুহাগুলিই সম্ভবত প্রাচীনতম। একসময় এখানে প্রায় শতাধিক সাধন-গুহা থাকলেও আজ মাত্র সাতটি অক্ষত রয়েছে। বারাবার টিলায়

রয়েছে চারটি গুহা। কর্ণ চৌপার, সুদামা, লোমশ ঋষি ও বিশ্বকর্মা। আর নাগার্জুন টিলায় আছে তিনটি। গোপীকা, বৈদান্তিকা ও ব্যাপীকা গুহা। বারাবার টিলায় গুহাগুলি আনুমানিক ২৪৫-২৫৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৈরি করেন সম্রাট অশোক। নাগার্জুন টিলার গুহাগুলি আনুমানিক ২৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৌর্য সম্রাট অশোকের নাতি সম্রাট দশরথের আমলে তৈরি হয়। প্রায় দশ ফুট উঁচু, চল্লিশ বাই কুড়ি ফুটের অর্ধগোলাকৃতি গুহাগুলিতে একটিই

প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথের দেওয়ালে রয়েছে ব্রাহ্মীলিপিতে খোদাই করে লেখা বেশ কিছু পঙ্‌ক্তি।

নাগার্জুন টিলার সামনে গাড়ি থেকে নেমে গাইডের সঙ্গে প্রথমে এলাম গোপীকা গুহায়, আর এখানেই দেখলাম অত্যাশ্চর্য পালিশের জাদু। মসৃণ এই পালিশের জন্য প্রতিবিম্ব আয়নার মতোই ফুটে ওঠে দেওয়ালের গায়ে। বিদেশ থেকে অনেক গবেষক এসে এই পালিশের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন কিন্তু আজ অবধি তাঁরা আবিষ্কার করতে পারেননি এই পালিশের মধ্যে কী কী যৌগ বা উপাদান আছে। তাই এই পালিশকে তাঁরা 'মৌর্য-পালিশ' নামে চিহ্নিত করেছেন। শুধু তাই নয়, অনাদরে পড়ে থাকা এই গুহাগুলির দেওয়ালে আজও ধুলো বসতে পারে না এই অত্যাশ্চর্য পালিশের কারণে।

নাগার্জুন টিলার আরও দুটি গুহা ঘুরে বারাবার টিলায় ফিরে এসে দেখলাম আরও চারটি গুহা। তবে গুহাগুলির মধ্যে গোপীকা গুহার পালিশ'ই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। সাতটি গুহার মধ্যে সুদামা ও লোমশ ঋষি হচ্ছে চৈত্য শ্রেণীর, অর্থাৎ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট গুহা যা ভারতে খুবই বিরল। সুদামা গুহা তৈরির সময় সম্রাটের পরিকল্পনা ছিল তিনকক্ষের গুহা নির্মাণের, কিন্তু ফাটল এসে যাওয়ায় কারণে প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হয়। গুহাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর দেওয়ালে অঙ্কিত রয়েছে কিছু সাংকেতিক রেখাচিত্র। লোমশ ঋষি গুহাটি তৈরির সময় পাথর চুঁইয়ে জল আসার কারণে অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, তবে প্রবেশ পথের মাথায় কারুকার্যটি আজও অক্ষত।

সাঙ্গ হলো গুহা দর্শন। এবার ঈশ্বর দর্শনের পালা। বারাবার টিলা থেকেই পথ গিয়েছে বাণাবর পাহাড়ে। এই পাহাড়েরই শীর্ষে ৺সিদ্ধনাথ শিবের প্রাচীন মন্দির। শ্রাবণ মাসে প্রতিদিন লক্ষাধিক ভক্তের ভিড়ে পূর্ণ থাকে বাবার মন্দির।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সমতল পথে পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের পাদদেশে। সামনের তোরণদ্বার পেরিয়ে পথ এখান থেকে পুরোটা খাড়াই। পাহাড়ে ওঠার আগে ঘুরে এলাম পাশের আনন্দ সরোবর থেকে। পুণ্যার্থীরা এই সরোবরে স্নান সেরে মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। জঙ্গলের পথ মাড়িয়ে একটু গিয়েই পেলাম পাহাড় ঘেরা টলটলে জলের এক বিশাল দিঘি। শান্ত নির্জন পরিবেশে দূরের ওই সবুজ চাদরমোড়া পাহাড়ের প্রতিচ্ছবি বুকে নিয়ে স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ সরোবর হয়তো আমারই আসার অপেক্ষায় ছিল।

আনন্দ সরোবর থেকে ঘুরে এসে শুরু হলো পাহাড়ে ওঠা। প্রায় ছশো খাড়াই সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে উঠতে হবে শীর্ষে। যদিও মাঝে মাঝেই রয়েছে বসে বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা। দু-চার ধাপ ওঠার পরে বুকে বেশ চাপ লাগে। প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় লাগল উপরে উঠতে। উঠতে কষ্ট হলো ঠিকই তবে পথশোভা ছিল অতুলনীয়। খাদের দিকে সবুজ পাহাড়ের ঢাল দূরের ওই নীল আকাশের কোলে উঠে সোহাগ করছে, কখনও-বা রুক্ষ মাঠের দল তাদের প্রেমে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পাহাড়শীর্ষে বাবার মন্দিরের একটু দূরে কয়েকটি পূজা-সামগ্রীর দোকান। ভক্তের দল পূজার ডালি কিনে চলেছে দেব দর্শনে। মন্দিরে ঢোকার আগে সিঁড়ির দু'পাশে রয়েছে কষ্টিপাথরের বেশকিছু প্রাচীন বিগ্রহ। ভক্তির আবেগে যতটা না মাহাত্ম্যপূর্ণ, তার থেকেও অনেক বেশি প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য এগুলির।

মূল মন্দিরে একদিকের প্রকোষ্টে রয়েছে দুটি মাতৃমূর্তি। কষ্টিপাথরের মূর্তিটি পরিষ্কার বোঝা না গেলেও শ্বেতপাথরের চতুর্ভুজা মূর্তিটি মহাসরস্বতীর। মা-কে প্রণাম জানিয়ে চলে এলাম পরের প্রকোষ্ঠে, এখানে ৺সিদ্ধনাথ শিবের লিঙ্গ-বিগ্রহের অধিষ্ঠান। অন্ধকারাচ্ছন্ন স্বল্পপরিসর গর্ভগৃহে জ্বলছে ঘিয়ের প্রদীপ। সাবধানে কয়েকধাপ সিঁড়ি টপকে নেমে এসে বাবাকে প্রণাম করলাম। তাঁর আশীর্বাদ পেলাম কিনা জানি না, তবে এই কষ্টকর যাত্রাপথের প্রাকৃতিক শোভা আজীবন স্মৃতি হয়ে অবশ্যই থেকে যাবে।

(প্রয়োজনীয় তথ্য : এখানে থাকার জায়গা নেই। সকালে রাজগির থেকে এসে ফিরতে ফিরতে বিকাল হয়ে যাবে। সঙ্গে টর্চ রাখা আবশ্যিক)। □

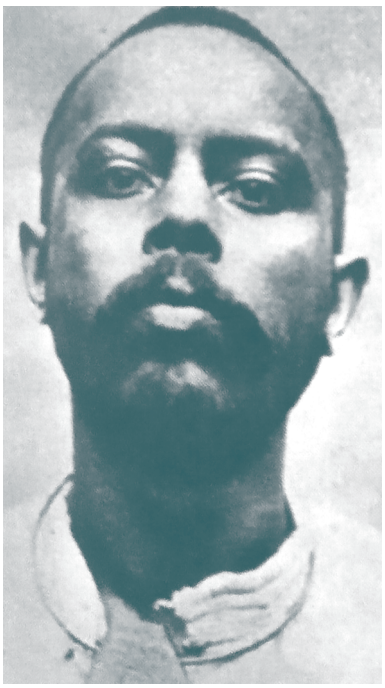

খণ্ডিত বঙ্গে থাকতে চাননি উল্লাসকর দত্ত

জহরলাল পাল

বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়া জেলার কালীকচ্ছ গ্রামে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের জন্ম। উল্লাসকরের মামা ছিলেন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁর নেতৃত্বে কালীকচ্ছ গ্রামে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। তাঁর ঘর স্বদেশী এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল। গুণী পিতা, যোগ্য মাতুল তথা প্রকৃত পরিবেশ পেয়ে স্বদেশপ্রেমের বীজ উল্লাসকরের হৃদয়ে কৈশোরেই জাগ্রত হয়।

গ্রামের পাঠশালা ও কুমিল্লায় স্কুলের পাঠ শেষ করে ১৯০৩ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য উল্লাসকর কলকাতায় এসে প্রথমে সিটি কলেজে এবং পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। বিপিনচন্দ্র পাল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও সান্নিধ্য ঘটে। ওই সময়ই বিপিনচন্দ্র পালের মেয়ে লীলা পালের সঙ্গে উল্লাসকরের প্রথম পরিচয় হয়। সাক্ষাতের স্থানটি ছিল ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ি। ওই বাড়িটি ছিল বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল এবং বোমা তৈরির নিভৃত কারখানা। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের একটি ঘটনা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। তখন বাঙ্গলায় স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার। জুলাই মাসে মিনার্ভা থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঠ করবেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশি সমাজ'। বিপিনচন্দ্র পালের কাছ থেকে খবর পেয়ে উল্লাসকর সেই সভায় উপস্থিত হন। কিন্তু অকারণে পুলিশ তাঁকে সেখানে নির্মমভাবে প্রহার করে। ওই ঘটনা উল্লাসকরের মনে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশ উত্তাল। মিছিলের পর মিছিল, চলছে অহিংস সংগ্রাম। সেই পরিস্থিতিতে একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক রাসেল ক্লাসের মধ্যে হঠাৎ বাঙ্গালিদের সম্পর্কে কটূ মন্তব্য করেন। এ নিয়ে ছাত্রমহলে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এগিয়ে এলেন ইডেন হিন্দু হস্টেলে থাকা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র উল্লাসকর দত্ত। একপাটি চটি কাগজে মুড়ে তিনি ক্লাসে ঢোকেন। সুযোগ বুঝে ক্লাসের মধ্যেই অধ্যাপকের পিঠে চটির সদ্ব্যবহার করে হট্টগোল বাঁধিয়ে দেন। পরিণতিতে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। এরপর তিনি মুম্বাইয়ে ভিক্টোরিয়া টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটে ভর্তি হন। কিন্তু বেশিদিন পড়াশোনায় যুক্ত না থেকে স্বদেশ চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়লেন। এবং বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শিবপুরে থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য নির্মাণের পরিকল্পনা করতে থাকেন।

যুগান্তর দলের অন্যতম নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে আলাপের পরেই চলে আসেন মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে। বারীন্দ্র ঘোষের দলে যুক্ত হয়ে পুরোপুরি নতুন মানুষে রূপান্তরিত হন। বিদেশি পোশাক ছেড়ে দিলেন। যুগান্তরের আখড়াই ছিল সহিংস বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু। ইংরেজ শাসনে অত্যাচার ক্রমেই বেড়ে চলল। একে-একে অনেককেই জেলে যেতে হলো। ইংরেজের দৃষ্টি আড়াল করতে বারীন্দ্র ঘোষ চার-পাঁচজনকে নিয়ে মানিকতলার বাগানবাড়িতে নতুন আখড়া তৈরি করেন। উল্লাসকর ওই বাগানবাড়িতে আসার পর আনন্দ ও উৎসাহের একটা বাতাবরণ গড়ে ওঠে। তিনি ছিলেন খুব আমোদপ্রিয় আর ভালো গাইয়ে। বাগানবাড়ি জমজমাট হয়ে উঠল। সদস্যসংখ্যাও বাড়তে লাগল। কাজের ছকও তৈরি হলো। বোমা তৈরির পরিকল্পনা শুরু হলো। বোমা তৈরি সম্পর্কে নানা বইপত্র ঘেঁটে চলেছে বিপ্লবীরা। প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরির বোমা সংক্রান্ত বইগুলো তাঁরা হস্তগত করলেন। উল্লাসকর নিজের বাড়িতে ছোটোখাটো একটা ল্যাবরেটরি বানিয়ে নিয়েছিলেন। নিজের অদম্য চেষ্টায় নানা কেমেস্ট্রি বইয়ের সাহায্যে তিনি বোমা তৈরি করতে সক্ষম হন। বলা যেতে পারে, এটিই বাঙ্গলার ইংরেজ তাড়ানোর প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র কারখানা। এরপর মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে তৈরি করেন আর একটি শক্তিশালী বোমা। বোমার শক্তি পরীক্ষা করার জন্য স্থান, কাল, ক্ষণ নির্ধারিত হলো। ১৯০৮ সালে ২৯ জানুয়ারি বিপ্লবীদের পাঁচজন চললেন দেওঘরের নির্জন দিঘিরিয়া পাহাড়ে বোমা পরীক্ষা করতে। দলনায়ক বারীন্দ্র ঘোষ, সঙ্গে বোমানির্মাতা উল্লাসকর দত্ত। উল্লাসকর বোমার শেষ পরীক্ষা সেরে নিলেন। বোমা ছুঁড়বেন পঞ্চরত্নের অন্যতম প্রফুল্ল চক্রবর্তী। তার পাশে দাঁড়ালেন উল্লাসকর। বোমা ছোঁড়া হলো। আকাশফাটা শব্দে বোমা ফাটল, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হলো চারদিক। কিন্তু ধোঁয়া সরে গেলে দেখা গেল, প্রফুল্ল চক্রবর্তীর দেহ ছিন্নভিন্ন। উল্লাসকরের বুকে আঘাতের চিহ্ন, কপালের একপাশ ফেটে চৌচির। প্রফুল্লের দেহে প্রাণ নেই, উল্লাসকরের অবস্থাও শোচনীয়। কলকাতায় এনে চিকিৎসা করে উল্লাসকর সেরে ওঠেন।

১৯০৮-এর ৩০ জানুয়ারি গুপ্ত সমিতির পক্ষ থেকে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকিকে মুজফ্ফরপুরে পাঠানো হলো কিংসফোর্ডকে চিরতরে শেষ করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাঁরা

দুর্ভাগ্যক্রমে বিফল হন। প্রফুল্ল ধৃত হয়ে নিজের রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ হয়। এই ঘটনার পর কলকাতা পুলিশের কর্মতৎপরতা ভীষণ বেড়ে যায়। চারদিকে ধরপাকড় ও খানাতল্লাশির প্রচণ্ড হিড়িক। ১৯০৮-এর ২ মে রাত চারটায় মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। সেখানে যারা ধরা পড়েছিলেন তাঁরা হলেন— বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায় প্রমুখ। অন্যান্য স্থান থেকে ধৃত হন অরবিন্দ ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন দাস, কানাইলাল দত্ত, নির্মল রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বিচারে ১৭ জনের বেকসুর মুক্তি হয়। তাদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষও ছিলেন। উল্লাসকর দত্ত ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সাত বছর কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। অন্যান্যদের বিভিন্ন মেয়াদের জেল বা দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

উল্লাসকর ও বারীন্দ্রের মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে চিত্তরঞ্জন দাশ হাইকোর্টে আপিল করেন। বারীন ও উল্লাসকর ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১, ১২১ক, ১২২ ও ১২৩ ধারায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এসব ধারায় বিচারের জন্য আগে সরকারের অনুমতি নেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। যদিও ১২১ক, ১২২ ও ১২৩ ধারার ক্ষেত্রে ওই অনুমতি নেওয়া হয়েছিল, ১২১ ধারার ক্ষেত্রে কিন্তু নেওয়া হয়নি। ১২১ ধারার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন বা নেওয়ায় ওই ধারাবলে দণ্ডদান অবৈধ। চিফ জাস্টিস লরেন্স জেংকিন্স ও বিচারপতি কার্ন ডাফের এজলাসে বিচার হচ্ছিল। তারা চিত্তরঞ্জনের এই অকাট্য যুক্তিকে স্বীকার করে নিলেন এবং বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকরের প্রাণদণ্ড মকুব করে তাঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

১৯০৯-এর ১১ ডিসেম্বর বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উল্লাসকর দত্ত-সহ সাতজনকে 'মহারাজ' নামের জাহাজে আন্দামানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৫ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় জাহাজ আন্দামান পৌঁছল। পোর্টব্লেয়ারে জাহাজ নোঙর করল। বন্দর থেকে তাদের পাঠানো হলো সেলুলার জেলে। কালাপানি যাওয়ার পর তাঁদের সেই জেলে আড়াই বছরের অধিক সময় আটক করে রাখা হয়। অন্যান্য কয়েদিদের সাধারণত সেখানে পৌঁছবার পর ছ' মাসের অধিককাল আবদ্ধ রাখা হতো না। কিন্তু উল্লাসকরকে 'ডি' টিকেট্স অর্থাৎ ডেঞ্জারাস ক্রিমিন্যাল আখ্যা দিয়ে প্রথম থেকেই তাঁর প্রতি কঠোর ব্যবহার প্রয়োগ হতে থাকে। জেলের ভেতরে থাকলে ঘানিটানা আর বাইরে সেটেলমেন্টে থাকলে ইট তৈরির ক্লান্তিকর কাজ। অমানবিক অত্যাচার, অমানুষিক ব্যবহার। প্রতিবাদ করলে আরও কঠোর শাস্তি। প্রয়োজনে ইলেকট্রিক শক্। আড়াই বছর পর সেটেলমেন্টে এসে উল্লাসকর এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'এই পরিবর্তন তপ্ত কড়াই থেকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।' ক্রমে ক্রমে তাঁর স্বাস্থ্য অবনতির দিকে যেতে থাকল। এমনকী, তিনি একবার আত্মহত্যারও চেষ্টা করেন। এ অবস্থায় তাঁকে আন্দামানের একটি পাগলাগারদে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে জেলের ডিরেক্টর জেনারেল আন্দামান আসেন। তিনি আলিপুর জেলে আগেই উল্লাসকরকে দেখেছিলেন। কিন্তু এ অবস্থায় উল্লাসকরকে দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে যান। তার চলে যাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে উল্লাসকরকে স্থানান্তরিত করা হুকুম হয়। তাঁকে মাদ্রাজ জেলে চালান করা হয়। অত্যাচারে তাঁর কপালের একটি শিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে হঠাৎ হঠাৎ উন্মত্ততার তড়কা আসত তাঁর শরীরে। বারো বছর লৌহকপাটের অভ্যন্তরে অর্ধমৃত, মানসিকভাবে প্রায় অক্ষম উল্লাসকর দত্তকে মুক্তি দেওয়া হলো ১৯২০ সালে। শর্ত আরোপ করা হলো— গ্রামের চৌহদ্দিতে থাকতে হবে নজরবন্দি হয়ে। সরকারের ভয়, চোখের আড়ালে গেলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভূমিকম্প ধরাতে কতক্ষণ। কয়েক মাস নজরবন্দি থাকার পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের চেষ্টায় উল্লাসকর মুক্তি পান।

এবার তাঁর কী করণীয়? মাথায় কখনও কখনও ভীষণ যন্ত্রণা দেখা দেয়, মানসিক ভারসাম্যও অনেক সময় ঠিক থাকে না। কিন্তু স্বাধীনতাস্পৃহা তখনও মনে জাগ্রত। রওয়ানা হলেন পণ্ডিচেরি। অরবিন্দের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু এ তো সেই অরবিন্দ নয়, উনি হলেন ঋষি অরবিন্দ, তাঁকে সাধনচ্যুত করা গেল না। ঋষিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে উল্লাসকর ফিরে আসেন। সঙ্গে চলতে থাকল তাঁর জীবনজীবিকার লড়াই। বন্ধুবান্ধবরা মধ্যে মধ্যে সাহায্য করেন। ইতিমধ্যে ১৯৩১ সালে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৮ মাসের কারাদণ্ড হয়।

কপর্দকহীন, পরনির্ভরশীল, অর্ধোন্মাদ উল্লাসকরের গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ এক বিরাট চমক। ১৯৪৮ সালে ৬৩ বছর বয়সে তিনি বিপিনচন্দ্র পালের মেয়ে লীলাদেবীকে বিয়ে করেন। দ্বীপান্তরে যাওয়ার আগেই তাঁদের বিয়ের ব্যাপারটা এগিয়েছিল। তবে তখন লীলাদেবী বিধবা এবং পক্ষাঘাতে পঙ্গু। বিধাতার হয়তো এটাই ইচ্ছা ছিল যে, স্বাধীনতার পূজারি এই বিপ্লবী যেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই সংসারজীবনে প্রবেশ করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় লীলাদেবীকে সই করিয়ে দু'শো টাকা করে পেনশনের ব্যবস্থা করা হয় এবং মুখ্যমন্ত্রী জনৈক বাস কেয়ারটেকারের মাধ্যমে লীলা দত্তের জন্য অতিরিক্ত দু'শো টাকা আয়ের ব্যবস্থা করে দেন। দৃঢ়চেতা উল্লাসকরের প্রতিজ্ঞা ছিল— 'যে সরকার দেশভাগ করেছে তার কোনও কাগজে তিনি সই করবেন না।'

খণ্ডিত বাঙ্গলায় থাকবেন না বলেই তিনি শিলচরে থাকতে মনস্থ করেন। ১৯৫১ সালের কোনও একদিন লীলা দত্তকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা থেকে 'সুন্দরবন ডেসপাস' নামের জাহাজে শিলচর অভিমুখে রওনা দেন। আটদিন পর তাঁরা শিলচর এসে পৌঁছান। শিলচর পরম সাদরে সস্ত্রীক উল্লাসকর দত্তকে বরণ করে নিল। শিলচরে তাঁকে অনেক আস্তানায় থাকতে হয়েছে। তবে প্রথম অবস্থায় পদ্মনগরে এবং শেষে দীর্ঘদিন জেল রোডে ভাড়াবাড়িতে অবস্থান করেন। শিলচরে তাঁর সঙ্গে অনেকেই দেখা করতে আসতেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী অজিতপ্রসাদ জৈন, অসমের রাজ্যপাল জয়রামদাস দৌলতরাম। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে যে কোনওরকম সাহায্যের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৬২ সালে লীলাদেবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিন বছর পর ১৯৬৫-র ১৭ মে উল্লাসকর দত্ত চিরনিদ্রায় শায়িত হন। □

পলাশীতে সিরাজের পরাজয়ে স্বস্তি পেয়েছিল বাঙ্গলা

বিনয়ভূষণ দাশ

ভারতবর্ষের ইতিহাস কয়েকটি বিন্দু বা বিশেষ সময়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। প্রথম বিন্দুটি আমার মতে, ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ। ওই বছরেই পৃথ্বীরাজ চৌহানকে হারিয়ে মহম্মদ ঘোরি ভারতবর্ষে পা রাখে এবং ভারতবর্ষে প্রথম স্থায়ীভাবে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন করে। দ্বিতীয় বিন্দুটি হলো, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ। এই বছর এক বিদেশি শাসক তুর্কি আরব বংশোদ্ভূত, আফসার জাতির সিরাজদ্দৌলাকে পলাশীর যুদ্ধে হারিয়ে আরেক বিদেশি শক্তি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গলার শাসন ক্ষমতায় আসে। তৃতীয় বিন্দুটি হলো, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং চতুর্থ বিন্দুটি হলো ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং দেশভাগ। 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব' বছরে আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, ঠিক কোন বিন্দু থেকে আমরা বিদেশিদের হাত থেকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছি।

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে, 'Doyen of Indian historians' ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

তিনি তাঁর 'হিস্টোরি অফ দি ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া'র প্রথম খণ্ডে লিখেছেন, 'Real history, on the other hand, teaches us that the major part of India lost independence about five centuries before (i.e, 1192 A.D.), and merely changed masters in the eighteenth century (i.e, 1757 A.D.)। ড. মজুমদার ওই পুস্তকে আরও লিখেছেন, The five hundred years of suffering under foreign rule sapped the vitality of the Hindus in Bengal, and explain their indifference to the new foreign conquest. উদ্ধৃত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বিন্দু অর্থাৎ সিরাজউদ্দৌলা ও ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধের আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। পলাশীর যুদ্ধ এবং সিরাজউদ্দৌলা উপাখ্যান ইতিহাসে গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর রাজত্বকৃতির জন্য নয়; পরন্তু তাঁকে হারিয়ে ইংরেজদের রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য। ১৭৫৬ সালে দাদু আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পরে তাঁর মনোনীত প্রার্থী সিরাজউদ্দৌলা নবাব হলেন অনেকের আপত্তি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও। আর সিরাজদ্দৌলা এতই দুশ্চরিত্র, দুর্বিনীত এবং নিষ্ঠুর ছিলেন যে তাতে বাঙ্গলার আমাত্যবর্গই শুধু নয়, সাধারণ প্রজারাও তাঁর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এছাড়া এই রাজনৈতিক সংকটের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলায় অর্থনৈতিক সংকটও দেখা যাচ্ছিল। আর ছিল মুসলিম শাসকের নিপীড়নে নির্যাতিত বাঙ্গলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মুসলিম নবাবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার এক তীব্র আকুতি।

২৩ জুন ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধ বাঙ্গলা তথা ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। আর জড়িয়ে গেছে বাঙ্গলার

তৎকালীন নবাব সিরাজদ্দৌলার নাম। ইংরাজদের হাতে ভারতের স্বাধীনতা হারানোর শুরুর ইতিহাসেও পলাশী এবং সিরাজের নাম যুক্ত হয়েছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সিরাজউদ্দৌলাকে ভারতীয়, এমনকী বাঙ্গালি পর্যন্ত বানিয়ে ফেলেছেন অনেকে। এমতাবস্থায় সিরাজউদ্দৌলা ও তৎকালীন বাঙ্গলার বিষয়ে কিছু আলোচনা ও লেখালেখির প্রয়োজন আছে।

সিরাজের পিতা জৈনুদ্দিন আহমেদ ছিলেন আরব দেশের মানুষ; দাদু আলিবর্দি খাঁ বিহারের শাসনকর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার সময়েই ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে বিহারে সিরাজের জন্ম হয়। তাঁর পিতা-মাতা জৈনুদ্দিন আহমেদ ও আমিনা বেগম। সিয়ার-উল-মুতাখেরিনের লেখক গোলাম হোসেন খাঁ সিরাজ সম্পর্কে নানান কটূক্তি করেছেন। আবার রিয়াজুস-সালাতিনের গ্রন্থকার গোলাম হোসেন সেলিমও সিরাজকে 'বদমেজাজি ও রূঢ়ভাষী' বলে সমালোচনা করেছেন। সিরাজ তাঁর দরবারের সমস্ত অভিজাত ব্যক্তি এবং সেনাপতিদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেন। ওই সময়ের ইউরোপীয় লেখকেরা তাঁর চরিত্রের বিরোধিতা করেছেন। এমনকী তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু কাশিমবাজারের ফরাসি কুঠির অধ্যক্ষ জা ল'ও তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, সিরাজের চরিত্র ছিল জঘন্যতম এবং লাম্পট্য ও নিষ্ঠুর স্বভাবে ভরপুর। ঐতিহাসিক উইলিয়াম ডালরিম্পল তাঁর The Anarchy গ্রন্থে সিরাজ সম্পর্কে লিখেছেন, Not one of the many sources for the period.....Persian, Bengali, Mughal, French, Dutch or English....had a good word to say about Siraj; according to Jean Law, who ws his political ally, 'His reputationa was the worst imaginable.

সুতরাং সিরাজ যে তরুণ বয়স থেকেই নিষ্ঠুর, নির্দয়, লোভী ও অসৎ চরিত্রের যুবক ছিলেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলিবর্দি সিরাজকে রাজ্য পরিদর্শনের জন্য হুগলী পাঠালে হুগলীর ফরাসি ও ওলন্দাজ কুঠির প্রধানেরা যুবরাজ সিরাজকে নানান উপঢৌকন দিয়ে সংবর্ধনা জানান। আবার কলকাতার ইংরেজগণও এ খবর শুনে নানা উপহার নিয়ে হুগলীতে উপস্থিত হয়ে সিরাজকে দান করেন। এজন্য তাঁদের খরচ হয় ১৫,৫৬০ টাকা। সিরাজও ইংরাজদের শিরোপা হিসেবে হাতি দান করেন। এসব খবর জেনে নবাব আলিবর্দিও খুশি হন। বাস্তবে দেখা যায়, সিরাজ ততটা ইংরেজ বিদ্বেষী ছিলেন না, নানান ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতই তাঁকে ইংরেজ বিদ্বেষী করে তোলে। সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের একটা 'LOVE-HATE' সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ তাঁর সম্পাদিত The History of Bengal (1757-1905)-এ লিখেছেন, Siraj was perhaps anti-English from a sense of self-interest. সিরাজ সম্পর্কে তিনি আরও লিখেছেন, 'Siraj-ud-daula is pictured as a bundle of nerves, a man of indecision, now inimical to the British, now friendly to them, now intent upon befriending the French, again soon after suffering them to be crushed by the British। আবার ঐতিহাসিক তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' গ্রন্থে লিখেছেন, এক কাব্যকাহিনি ছাড়া আর কিছুতে তো সিরাজউদ্দৌলাকে কোনওক্রমে শহিদ বানাতে পারা যাচ্ছে না।

সুতরাং এহেন সিরাজ যখন আলিবর্দির উত্তরাধিকারী হিসেবে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গলা, বিহার ও ওড়িশার নবাব হলেন তখন তাঁর পূর্বকৃত বিভিন্ন দুষ্কর্মের জন্য শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েই মসনদে আরোহণ করলেন। বিভিন্ন হিন্দুগোষ্ঠী নবাবদের নানান অত্যাচার, ধর্মীয় বিধিনিষেধ, অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদি কারণে এই বিদেশাগত নবাবদের উপর ক্ষুব্ধ হয়েই ছিল; এর সঙ্গে যুক্ত হলো নতুন নবাব সিরাজের নানা খামখেয়ালি কাজকর্ম। বিদেশি মুসলমান নবাবদের অত্যাচারে জর্জরিত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা মুসলমান শাসকদের হাত থেকে মুক্তি চাইছিল। বিহারের দুই বৃহৎ জমিদার নবাবকে উৎখাত করার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুতও হয়েছিল। সুতরাং তাঁরা এঁদের হাত থেকে মুক্তি পেতে যে কোনো শক্তির সঙ্গে সহযোগ করতে তৈরি ছিল। সিরাজের দাদু আলিবর্দি খাঁ কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে একবার বন্দি করে রেখেছিলেন; তাই তিনিও ক্ষুব্ধ ছিলেন। নাটোরের রানি ভবানী ক্ষুব্ধ ছিলেন তাঁর কন্যার প্রতি সিরাজের কুব্যবহারে। সুতরাং, সিরাজ চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েই সিংহাসনে বসেছিলেন। বাঙ্গলায় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল এটা পুরোপুরি বিদেশি আগ্রাসকদের শাসন। দিল্লির বাদশাহদের দ্বারা সমস্ত উচ্চপদে নিযুক্তি হতো বহিরাগত পার্সিয়ান, মধ্য এশিয়া থেকে আগত তুর্কি এবং আফগান ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধাদের। বাঙ্গলায় নবাবি রাজত্বের আরেকটা বৈশিষ্ট্য ছিল— নবাব দরবারে দুটি গোষ্ঠী। একটি গোষ্ঠী পুরোপুরি বিদেশি, একদল বিদেশি ভাগ্যান্বেষী, ভাড়াটে সৈন্য যা পার্সিয়া, মধ্য এশিয়া এবং আফগান ভাগ্যান্বেষী সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত গোষ্ঠী, এঁরা মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারের একটা শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী ছিল। আর এই গোষ্ঠীই নবাবি সৈন্যের শক্তিশালী অংশ ছিল।

বিশ্বাসঘাতকতা, অসৌজন্য আর সীমাহীন লোভ ছিল এই গোষ্ঠীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় গোষ্ঠীতে ছিল বাঙ্গলা ও বিহার থেকে নিযুক্ত হিন্দুরা। এঁদের প্রধানত নিযুক্ত করা হতো রাজস্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগে। কারণ ওইসব কাজে বহিরাগত বিদেশিদের দক্ষতা ছিল না একেবারেই। আলিবর্দি খাঁ আফগানগোষ্ঠীর উপর নির্ভর করতেন, কিন্তু ওইসব আফগান সেনারা দুবার তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

অনেক ঐতিহাসিক বলার চেষ্টা করেছেন যে সিরাজ সিংহাসনে বসার পরে নিজেকে পালটে নিয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে তাঁদের বক্তব্য, সিরাজ তাঁর মাসি যিনি তাঁর সিংহাসনে বসার বিরোধী ছিলেন সেই ঘসেটি বেগমকে বুঝিয়ে সুঝিয়েই বাগে আনেন। কিন্তু ঘসেটি বেগমকে বাগে আনতে সিরাজকে বিশেষ সাহায্য করেছিল তাঁর মাতামহী (আলিবর্দি খানের স্ত্রী) ও জগৎ শেঠ। তাঁদের বিশেষ অনুরোধে এবং ঘসেটির আধা-সেনা বাহিনীর দুই পদাধিকারী মির নজর আলি ও বৈরাম খাঁ ঘসেটিকে ত্যাগ

করায় তিনি (ঘসেটি) সিরাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু এই ঐতিহাসিকরা ভুলে যান, তাঁর অপর মাসিপুত্র শওকত জঙ্গের সঙ্গে তাঁর আচরণ। বাস্তবে ও দুর্বুদ্ধিতেও সৌকত জং সিরাজউদ্দৌলারই মাসতুতো ভাই। দুজনের কেউই ফেলা যান না। যাইহোক, তাঁকে ও নওয়াজিস মহম্মদকে বঞ্চিত করে আলিবর্দি সিরাজকে ভাবী নবাব হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। সিরাজের মাসির ছেলে সৌকত জং নিজেও নবাবপদের প্রত্যাশী ছিল। ফলে সিরাজদ্দৌলা যখন কাশিমবাজার কুঠির ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে ব্যস্ত, সেই অবসরে সৌকত জং গোপনে দিল্লির বাদশাহের উজির ঘাজিউদ্দিনের কাছ থেকে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবি বাদশাহি 'ফরমান' জোগাড় করে ফেলে, এক কোটি টাকা ঘুষের বিনিময়ে। মিরজাফরও গোপনে সৌকত জংকে এ ব্যাপারে মদত জোগায়। যাইহোক, এই সংবাদ পেয়ে সিরাজউদ্দৌলা রাইদাস বিহারী নামে এক প্রতিনিধি পাঠিয়ে সৌকত জঙের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু সিয়ার-উল- মুতাকসরিনের লেখক গোলাম হোসেন খান এবং তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ শেখ জাহান ইয়ারের পরামর্শ না মেনে কড়াভাষায় জানিয়ে দেয় যে, সে নিজে মুঘল সম্রাটের 'নবাবি ফরমান' পেয়েছে; সুতরাং সিরাজ যেন বাঙ্গলা, বিহার ও ওড়িশার নবাবি কর্তৃত্ব তাঁর হাতে হস্তান্তর করে ঢাকায় চলে যায়। ফলে সিরাজউদ্দৌলা তৎক্ষণাৎ সৌকত জংকে দমন করার জন্য ৯ অক্টোবর ১৭৫৬ তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষদের মোহনলাল, দোস্ত মোহম্মদ, দীন মুহাম্মদ, মির মোহম্মদ ও মিরমদনকে দক্ষিণ দিকে থেকে পুর্ণিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর উত্তর থেকে বিহারের সহকারী নবাব রাজা রামনারায়ণকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন। অন্যদিকে শেখ জাহান ইয়ার, কারগুজার খাঁ এবং মির মুরাদ আলিকে সঙ্গে নিয়ে সৌকত জংও পূর্ণিয়া থেকে অগ্রসর হলেন। পুর্ণিয়ার ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, মনিহারীতে দুই পক্ষের সৈন্যদল সামনাসামনি হলো ১৭৫৬-র ১৬ অক্টোবর। মদ্যপ অবস্থায় সৌকত জং সিরাজদ্দৌলার সৈন্যবাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করল। কিন্তু অকস্মাৎ একটা মাস্কেটের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে সৌকত মারা যায়। এইভাবে সিরাজ সৌকত জঙের বিরোধিতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল।

আলিবর্দি খাঁ মারা আবার আগে কিছু ক্ষেত্রে ইংরেজদের সঙ্গে আপোশমূলক নীতি গ্রহণ করলেও সিংহাসনে বসার পর সিরাজ তাঁদের সঙ্গে সংঘাতের নীতিই গ্রহণ করেন; আরেক বিদেশি শক্তি ফরাসিদের সঙ্গে কিন্তু তিনি মিত্রতার নীতি অবলম্বন করেন। তিনি ঔদ্ধত্য নিয়েই নবাবি চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং যে সমস্ত ঐতিহাসিকের মতে সিরাজ সিংহাসনে বসে পালটে গিয়েছিলেন তাঁরা খুব সহজেই ওই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। মাত্র চোদ্দ বা পনেরো মাসেই সিরাজ পালটে গেল এটা ভাবাও বাতুলতা।

বলা হয়, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ হেরেছিল বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রে। কিন্তু যেসমস্ত সভাসদ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল তাঁদের মধ্যে যারা হিন্দু তাঁরা তো ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অত্যাচারী বিদেশি নবাবের শাসনমুক্ত হতে চেয়েছিল। বিহারের দুজন হিন্দু জমিদার তো বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিল এ বিষয়ে। রানি ভবানী বা নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও একই ভাবনায় ভাবিত ছিলেন। তবে রানি ভবানী, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও রাজা রাজবল্লভ সরাসরি সিরাজবিরোধী চক্রান্তে জড়িত ছিলেন এমন কথা ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেননি। যদিও নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। এখানে স্মর্তব্য যে, যে সমস্ত হিন্দু সভাসদ সিরাজকে ঘসেটি বেগম এবং সৌকত জংকে দমনে বিশেষ সাহায্য করেছিল একমাত্র মোহনলাল ছাড়া পলাশীর যুদ্ধে আর কারও সাহায্য নেননি। সিরাজের দুর্ব্যবহার তাঁদের বিরোধী শিবিরে ঠেলে দিয়েছিল।

নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা নিজে তো বিদেশি আফসার বংশসম্ভূত, বহিরাগত নবাব। তিনি নিজে একদিকে তাঁর স্বার্থবিরোধী বলে ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, অন্যদিকে আবার অন্য বিদেশি ফরাসিদের সাহায্য নিয়েছিলেন। ফরাসি বুসি ও সিনফ্রে ছিলেন তাঁর বিশেষ সহযোগী। সুতরাং পলাশীর লড়াইটা স্বাধীনতার জন্য নয়; দুটি বিদেশি শক্তির আধিপত্যের লড়াই। একদল আগে এসেছিল; আর অন্যদল সাম্প্রতিক—তফাত এটুকুই। আবার নবাব সিরাজ মিরজাফর বিশ্বাসঘাতক জেনেও এবং তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী মিরমদন ও মোহনলাল এবং খাজা হাদির পরামর্শ সত্ত্বেও মিরজাফরকে হত্যা না করে, তাঁর বাড়ি অবরোধ করেও আবার তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে আনুগত্যের চুক্তি করেছে।

পূর্বোক্ত ত্রয়ীর বক্তব্য ছিল, 'We ought to put them (Mirjafar and Khadim Khan) down first, so that the English on hearing the news, will themselves take to flight. The presence of these two will be the cause of distraction and anxiety to us (the loyal generals) as they are sure to practice treachery, তাঁদের এই সাবধানবাণী বাস্তবে মিলে গিয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধে মিরজাফর অংশগ্রহণ করবে না জেনেও তাঁর অধীনে বিশাল সৈন্যবাহিনী রেখে দিয়েছিল। আর মিরজাফর কোরান স্পর্শ করেও শপথ নিয়েও সে শপথ ভেঙেছিল। পলাশীর যুদ্ধে যখন মোহনলালের নেতৃত্বে নবাবের বাহিনী এগিয়ে চলেছে তখন দেশপ্রেমিক মোহনলালের অনুরোধ না মেনে বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের কথা শুনে যুদ্ধ বন্ধ করা এসবই সিরাজের দুর্বলচিত্ততা এবং যুদ্ধ সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার লক্ষ্মণ। এমনকী নবাব সিরাজউদ্দৌলা নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকেও সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে শিবিরে বসে ইয়ারদোস্তদের সঙ্গে হাসিমশকরায় ব্যস্ত ছিলেন। এইসব কারণেই মুষ্টিমেয় সংখ্যক সৈন্য নিয়েও ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরাজরা পলাশীর যুদ্ধ জিততে পেরেছিল নবাবের বিশাল সংখ্যক সৈন্যবাহিনীকে হারিয়ে।

বাস্তবে, সঠিক অর্থে পলাশীতে কোনো যুদ্ধই হয়নি, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা হয়েছে মাত্র। এই যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য সিরাজ নিজেই মুখ্যত দায়ী। আবার এই যুদ্ধে জিতলেও ফরাসি বণিকেরা প্রাধান্য পেত; ইংরাজদের বদলে ফরাসি প্রাধান্য স্থাপিত হত। ফরাসি

সেনাপতি বুসি ও সিনফ্রে বাঙ্গলার রাজনৈতিক কর্তৃত্বে আসত। কেন জানি না, ঐতিহাসিকেরা এই দিকটি কেন এড়িয়ে যান। সিরাজউদ্দৌল্লা স্বাধীনতাযোদ্ধা ছিলেন না কোনও ভাবেই। তিনি নিজেই ছিলেন বিদেশি; আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নির্ভর করেছিলেন আরেক বিদেশি শক্তি ফরাসিদের উপর। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, যাঁদের সাহায্যে সিরাজ পুর্ণিয়ার সৌকত জংকে হারালেন, ঘসেটি বেগমকে বাগে আনতে সক্ষম হলেন, কাশিমবাজার ও চন্দননগর থেকে ইংরাজদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হলেন, দেখা গেল, পলাশীর যুদ্ধে তাঁদের অধিকাংশেরই সাহায্য নিলেন না, উপরন্তু তাঁদের নানাভাবে অপদস্থ করেছেন। এমনকী তাঁর সৈন্যবাহিনীর যে অংশ সবচেয়ে দক্ষ, রাজা রামনারায়ণের অধীনস্থ সেই সৈন্যবাহিনীকে আগে থেকে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে আসার নির্দেশ দিলেন না।

ঐতিহাসিক ব্রিজেন কিশোর গুপ্ত তাঁর 'সিরাজুদ্দৌলাহ' গ্রন্থে লিখেছেন, The best troops of the nawab were deployed under Raja Ramnarain on the Bihar frontier to meet the attack, were it to materialize. This had led to a serious division of the nawab's forces. What was left in the province of Bengal were troops under unrealiable commanders.

সিরাজ ১৭৫৬ সালে ইংরাজ কোম্পানির বিরুদ্ধে কলকাতা অবরোধ করেন এবং জিতেও যান। তা সত্ত্বেও কেন কলকাতা সুরক্ষিত রাখতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলেন না তাও এক প্রহেলিকা। কারণ তারপরে মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরাজ সৈন্য এসে আবার কলকাতা দখল করতে সক্ষম হয়।

যাইহোক, ১৭৫৭-তে পলাশীর আমবাগানে নবাব সিরাজদ্দৌলা ও ক্লাইভের অধীনে ইংরাজ সৈনিকদের সেই যুদ্ধের অভিনয়ে ক্লাইভ জিতে গেলেন। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে বণিকের রাজত্ব শুরু হলো। যদিও আমার মতে, ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে এটা সঠিকভাবে শুরু নয়, ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহমেদ শাহ্ আব্দালি মারাঠাদের হারিয়ে দেবার ফলে তাঁরা কিছুদিনের জন্য হৃতশক্তি হবার ফলেই বাস্তবে ব্রিটিশদের উত্থান সম্ভব হয়।

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের হেরে যাওয়ার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এই যুদ্ধে ইংরাজরা জিতে যাওয়ার ফলে তাঁরা ধীরে ধীরে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে, শুধুমাত্র আর একটা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকে না— 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে' দেখা দেয়। শুরু থেকেই তাঁরা রাজত্ব শুরু করে দিলেন না ঠিকই, কিন্তু বাঙ্গলার ভাগ্যনিয়ন্তা তাঁরাই হয়ে দাঁড়ালেন। তবে পরিহাস এটাই যে, ইংরাজরা নিজেরাও পলাশীর যুদ্ধ জেতাকে 'রাজ্যজয়' বলে কোথাও চিহ্নিত করেনি। তাঁরা এটাকে একটা 'রেভোলিউশন' বা বিপ্লব বলে আখ্যাত করেছে। তবে পরবর্তীকালে আমাদের দেশের ঐতিহাসিকরাও একে 'পলাশী বিপ্লব' বলেই অভিহিত করেছেন। এই বিপ্লবকে হিন্দুরা সাধারণভাবে স্বাগত জানিয়েছে। এঁর একটা কারণ হয়তো এটাই যে, মুসলমানদের দীর্ঘ রাজত্বে তাঁরা নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিন কাটিয়েছে। এদেশের হিন্দুরা সবসময়ই বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করেছে; কখনো সফল হয়েছে, কখনো-বা হয়নি।

কিন্তু তাঁরা শক, হুণদল, পাঠান, মোগল— সব বিদেশি আক্রমণই প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাঁরা ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক— সমস্ত ক্ষেত্রেই মুসলিম রাজত্বকালে তাঁরা অত্যাচারিত হয়েছে। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'এক আকবর বাদশার রাজত্বকাল ছাড়া অন্য কোনো নবাব-বাদশার আমলে পার্থিব জগতের লৌকিক ব্যাপারে হিন্দুদের উন্নতির কোনোই আশা-ভরসা ছিল না। সাধারণ হিন্দু প্রজারা ছিলেন ক্রীতদাসের শামিল। 'মুসলমান রাজত্বের আরেকটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁদের পূর্বপুরুষের দেশ থেকে মুসলিম ধর্মীয় পণ্ডিত, ধর্মপ্রচারকারী, সৈন্যদের নিয়ে এসে এদেশের শাসন ও সেনা বিভাগের নানা কাজে নিযুক্ত করা। রাজস্ববিভাগে কাজ করার উপযুক্ত লোক কম পাওয়া যেত বলে তাঁরা এদেশের হিন্দুদের ওই বিভাগে নিযুক্ত করতে বাধ্য হতো। আর হিন্দু সমাজের প্রাণের ভিতরকার আগুন একেবারে নিভে যায়নি। একসময়ে জ্ঞানী-গুণী মানুষদের ধারক ছিলেন দেশের রাজা আর জমিদারেরা। এঁদেরই দায় ছিল তাঁদের উচ্চবৃত্তি থেকে রেহাই দেবার। বিদেশি মুসলমান রাজপুরুষরা হিন্দুদের সম্বন্ধে সে দায় স্বীকার করেনি। তাঁরা সাধারণত বুঝতেন গায়ের জোর। আদর করতেন সেনাপুরুষদেরই। জায়গির দিতেন বড়ো বড়ো সেনাধ্যক্ষদের। ইচ্ছে থাকলেও হিন্দু ভূস্বামীরা সব সময় সে দায়ের ভার গ্রহণ করতে পারেনি।

হিন্দুরা এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। ইংরাজ রাজত্ব তাঁদের সেই সুযোগ করে দিয়েছিল। মুসলমানি আমলে দেশের থেকে হিন্দুদের কিছু পাবার সম্ভাবনা ছিল না। মুসলমানরাও এদেশকে স্বদেশ বলে মনে করতেন না। তাছাড়া, পলাশী যুদ্ধের কিছু আগেকার অধিকাংশ মুসলমান রাজপুরুষই বিদেশাগত, কালচারহীন অস্ত্রধারী সৈনিক পুরুষ। এ-দেশ তাঁদের কাছে হয় শুধু রাজত্ব ফলাবার নয় কেবল লুঠ করবার দেশ। সুতরাং তাঁরাও প্যাটরিয়াটিসম-এর ধার ধারতেন না। ---বলেছেন ঐতিহাসিক তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

এই অবস্থায় তাঁরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইংরাজদের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য হিন্দুরা একটু থিতু হয়ে বসার পরে এই বিদেশি ইংরাজদের বিরুদ্ধেও আগের মতোই প্রতিরোধ গড়ে তোলে, স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে ধাবিত হয়। আর মুসলমানেরা বরাবরের মতই 'কালনেমির লঙ্কাভাগে' ব্যস্ত হয়ে পড়ে, স্বাধীনতা আন্দোলন নয়, তাঁদের কাছে প্রধান হয়ে ওঠে দেশভাগ করে পাকিস্তান আদায়। 'তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি দিয়েই এই প্রবন্ধের উপসংহার টানছি। তিনি বলেছেন, 'হিন্দুদের কাছে আবার বিদেশি রাজত্ব অসহ্য হলো। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান হলো। আমাদের জীবনধারা আর একটা মোড় ফিরল। এখন আর এক নবযুগের অভ্যুদয়।' □

অসম্ভবকে সম্ভব করে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হয় ভারত

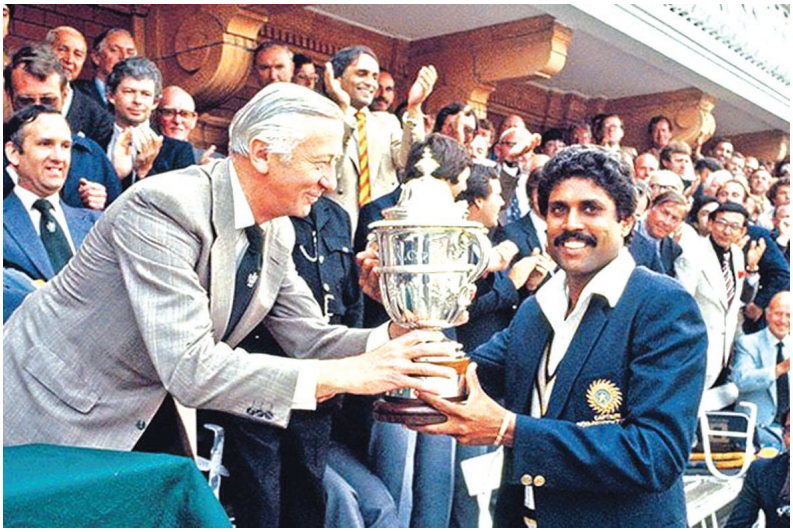

নিলয় সামন্ত

অংশগ্রহণই আসল, ফলাফল নয়। কোনও অলিম্পিক গেমসে নয়, কার্যত এই মন্ত্র নিয়ে ১৯৮৩ বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েছিল কপিল দেবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ক্রিকেট দল। তখনও ওয়ান ডে ফর্ম্যাটের সঙ্গেই ঠিক মতো সড়গড় ছিল না ভারত। তা সত্ত্বেও তাঁদের পারফর্ম্যান্সে যে এমন চমক অপেক্ষা করে ছিল, আগে থেকে তার আঁচ পাওয়া সম্ভব ছিল না ক্রিকেটবিশ্বের।

২৫ জুন, ১৯৮৩ : লর্ডসে ইতিহাস গড়েছিলেন কপিলরা। তবে, তারপর যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা বেশ মজার। ম্যাচের আগে কপিলদেব একটা শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে মাঠে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী রোমি বলেছিলেন শ্যাম্পেন নিচ্ছ যদি হেরে যাও ? জবাবে কপিল বলেছিলেন, আরে হারলেও শ্যাম্পেনের বোতল খুলবো। প্রথমবার ফাইনালে উঠেছি বলে কথা !

ম্যাচের পর দেখা গেল ভারতের সাজঘরে একটা মাত্র শ্যাম্পেনের বোতল। যাতে না করা যাবে শ্যাম্পেনে স্নান, না ঢালা যাবে গলায়। এদিকে সবাই আনন্দে উদ্ভাসিত। উলটোদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাজঘরে তিনটে ফ্রিজ ভর্তি শ্যাম্পেনের বোতল। যা ওরা জেতার পর উৎসব করার জন্য এনে রেখেছিল। কিন্তু সবাই শোকে মুহ্যমান।

কপিল করলেন কী সটান ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাজ ঘরে ঢুকে পড়লেন। গিয়ে শোকাতুর ক্লাইভ লয়েডের কাঁধে হাত রেখে বললেন, দুঃখ করো না। তোমার ভাগ্যটাই খারাপ ছিল আজ। পরের বার ভালো সময় আসবে। লয়েড সান্ত্বনা পেয়ে আরও একটু মাথা নীচু করলেন। এবার কপিল লয়েডের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, তোমাদের ফ্রিজ ভর্তি তো শ্যাম্পেন। ওগুলো কি আজ তোমাদের কোনও কাজে লাগবে ! লয়েড স্মিত হেসে বলেছিলেন না ওগুলো আজ আমাদের কোনও কাজে লাগবে না। ওগুলো তোমরা নিয়ে যাও। ওগুলো তোমাদের কাজে লাগবে। কপিল তখন আর কাল বিলম্ব না করে কাঁধের তোয়ালে মাটিতে ফেলে তাতে শ্যাম্পেনের বোতলগুলো সাজিয়ে নিয়ে কাঁধে ফেলে নিজেদের সাজঘরে চলে এসেছিলেন উৎসব করতে।

এ থেকেই বোঝা যায় সেদিন ভারতের হারাবার কিছু ছিল না। আনন্দের সঙ্গে খেলে খেলাটাকে উপভোগ করতে করতেই বিশ্ব জয় করে ফেলেছিলেন।

লিগের ম্যাচে তারকাখচিত ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানোটাই ভারতীয় দলে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করে। টুর্নামেন্টে যাদের একবার হারানো গিয়েছে, ফাইনালে তাদের আবার কেন পরাস্ত করা যাবে না? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রবল ইচ্ছা নিয়ে মাঠে নামা ভারত ৩৭ বছর আগে ঠিক এই দিনটিতেই ইতিহাস গড়েছিল লর্ডসে। ১৯৮৩-র ২৫ জুন জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে প্রথমবার দেশকে বিশ্বচ্যাম্পিয়নের গৌরব এনে দেন কপিলরা।

ফাইনালে লড়াইটা ছিল ডেভিড বনাম গোলিয়াথের। একদিকে গর্ডন গ্রিনিজ, ডেসমন্ড হেইন্স, ভিভ রিচার্ডস, ক্লাইভ লয়েড, ম্যালকাম মার্শাল, অ্যান্ডি রবার্টস, জোয়েল গার্নার, মাইকেল হোল্ডিংয়ের মতো মহাতারকারা। অন্যদিকে কপিলের নেতৃত্বাধীন আন্ডারডগ ভারত।

ফাইনালের প্রথমার্ধটাও ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের দখলে। টস জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৫৪.৪ ওভারে (৬০ ওভারের ম্যাচ ছিল) ভারত অল-আউট হয়ে যায় মাত্র ১৮৩ রানে। সর্বোচ্চ ৩৮ রান কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের। এছাড়া অমরনাথ ২৬, সন্দীপ পাতিল ২৭, মদন লাল ১৭, কপিল দেব ১৫, যশপাল শর্মা ১১, কিরমানি ১৪ ও বলবিন্দর সাঁধু ১১ রানের যোগদান রাখেন। গাভাসকার ২ রান করে আউট হন।

জবাবে ব্যাট করতে নামা ওয়েস্ট ইন্ডিজ শিবিরে ধস নামান মদন লাল ও অমরনাথ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫২ ওভারে অল-আউট হয়ে যায় ১৪০ রানে। রিচার্ডস ৩৩ রান করেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। মদন লাল ও অমরনাথ ৩টি করে উইকেট নেন। ২টি উইকেট সাঁধুর। ১টি করে ইউকেট দখল করেন কপিল দেব ও রজার বিনি। ৪৩ রানে ম্যাচ জিতে প্রথমবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হয় ভারত। সেই সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী বিশাল ইমারতের শক্ত ভিত গড়ে দিয়ে যান কপিলরা। ফাইনালের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হন অমরনাথ। ■

দেবী সরস্বতী

ছোটো বন্ধুরা, শীতের অবসানে যখন চারিদিকে বসন্তের আগমন বার্তা ধ্বনিত হয়, তখন প্রকৃতি নব সাজে সজ্জিত হয়। গাছে গাছে দেখা দেয় নব মঞ্জরী। কুসুম কানন কুন্দ পুষ্পে শোভিত হয়। সেই সময় মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে আমরা বাগ্‌দেবী সরস্বতীর আরাধনায় ব্রতী হই।

বাগ্‌দেবী সরস্বতীকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কৌতূহল রয়েছে আমাদের মধ্যে। যেমন, সরস্বতীকে জ্ঞানের দেবী বলা হয় কেন? সরস্বতীপুজো শ্রীপঞ্চমী তিথিতেই হয় কেন ইত্যাদি। শাস্ত্রে বলা আছে সরস্বতী বিদ্যার দেবী। এর পূজা করলে বোধশক্তি জাগ্রত হয়। সংগীতের তাল-লয়-সুর, রাগরাগিণী ইত্যাদি এই দেবীরই সৃষ্টি। সাত প্রকার স্বরের জ্ঞান দান করেন বলেই এই দেবীকে সরস্বতী বলা হয়। সরস্বতীর হাতে থাকে বীণা। সংগীতকার, লেখক, কবি, ছাত্র-ছাত্রী এই দেবীর পূজা করেন। এই দেবীর আরাধনার মূল কথাই হলো সর্বদা জ্ঞানচর্চা।

সরস্বতীর আশীর্বাদে কালিদাস মহাকবি হয়েছিলেন। একবার প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবী সরস্বতীকে কোনো এক যোগ্য পুরুষের মুখে প্রবেশ করে তার কবিত্ব শক্তির প্রকাশ ঘটাতে বলেছিলেন। মা সরস্বতী সেরূপ পুরুষের সন্ধানে বেরিয়েছেন। পথে দেখলেন, গাছে ক্রীড়ারত একজোড়া ক্রৌঞ্চপাখির একটিকে ব্যাধের হাতে মরতে দেখে মহর্ষি বাল্মীকি হঠাৎ বলে উঠলেন— মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধী কামমোহিতম্।। বাল্মীকির মুখে সেই শ্লোক শুনে মা সরস্বতী তাঁর মুখে প্রবেশ করেন এবং সেই মুনিকে খ্যাতিবান করে তুলেছিলেন।

একবার প্রজাপতি ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণের তপ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর দিতে গিয়ে ভাবলেন, এ ব্যক্তিকে বর দিলে তো জগতের পক্ষে মহা অনিষ্টকারী হবে। এসব ভেবে তিনি সরস্বতীকে কুম্ভকর্ণের শরীরে প্রবেশ করে তার বুদ্ধি ভ্রংশ করে দিতে বললেন। সরস্বতী কুম্ভকর্ণের শরীরে প্রবেশ করলেন। এরপর কুম্ভকর্ণকে ব্রহ্মা যখন বর প্রর্থনা করতে বলেন তখন কুম্ভকর্ণ ছ'মাস ঘুমিয়ে থাকার বর প্রার্থনা করলেন। এইভাবে শেষ পর্যন্ত সরস্বতী কুম্ভকর্ণের বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ান।

দেবীপুরাণ ও প্রাচীন শাস্ত্রে সরস্বতীকে সতী, সাবিত্রী, অম্বিকা, বাগ্‌দেবী, বাণী, সারদা, ভারতী, বীণাপাণি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

দেবী সরস্বতী হাতে বীণা ধারণ করে রেখেছেন কেন?

শাস্ত্রে আছে যে, কৃষ্ণবর্ণ বা কালো হলো তমোগুণের প্রতীক। রক্তবর্ণ হলো রজোগুণের প্রতীক এবং শ্বেত বা শুক্লবর্ণ হলো সত্ত্বগুণের প্রতীক। সত্ত্বগুণ জ্ঞানপ্রদা ও অজ্ঞাননাশক। সরস্বতী সত্ত্বগুণময়ী দেবী। তিনি শুদ্ধ জ্ঞানময়ী। প্রথমে তিনি নদী ছিলেন। সরস্বতী নদীর তীরেই বৈদিক সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছিল। তাই তিনি নদী থেকে জ্ঞানের দেবী হয়েছেন। তাঁর আরাধনায় মানুষের বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, মেধা লাভ হয় এবং পারমার্থিক ও জাগতিক সর্ববিদ্যাতেই মানুষের পারদর্শিতা লাভ হয়ে থাকে। মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে জ্ঞানপিপাসু মানুষ তাঁর আরাধনায় ব্রতী হন। এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষও মা সরস্বতীর আরাধনায় ব্রতী হয়েছেন।

বিশ্বজিৎ সাহা

ভারতের বিপ্লবী

নলিনীকান্ত বাগচী

বিপ্লবী নলিনীকান্ত বাগচীর আদি নিবাস নদীয়া জেলার শিকারপুরে হলেও জন্ম(১৮৯৬) ও বড়ো হন মুর্শিদাবাদের কাঞ্চনতলায়। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়ার সমম বিপ্লবী দলে যোগ দেন। পুলিশের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য পাটনার বাঁকিপুর কলেজ ও ভাগলপুর কলেজে পড়াশোনা করেন। আইএ পাশ করার পর আত্মগোপন করতে হয়। দানাপুরে সৈন্যদের মধ্যে অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করেন। দলের নির্দেশে গৌহাটির গোপন আড্ডায় আশ্রয় নেন। সেখানে পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষের পর পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসেন এবং পরে ঢাকায় যান। ঢাকায় ফলতা বাজারের ঘাঁটি পুলিশ ঘিরে ফেললে গুলি বিনিময়ের পর সংঘাতিকভাবে আহত হয়ে গ্রেপ্তার হন। সেই দিনই (১৯১৮, ১৫ জুন) ঢাকা জেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

জানো কি?

- বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় আলোর প্রতিসরণের জন্য আকাশ নীল দেখায়
- বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি হলো সাহারা।
- বিশ্ব বই দিবস পালিত হয় ২৩ এপ্রিল।
- ভুটানকে বজ্রপাতের দেশ হলা হয়
- ভারতের রাজ্যসভাকে বয়স্কদের ঘর বলা হয়।
- বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী'র রচয়িতা বাণী কুমার।।
- নয়া দিল্লির স্থাপত্যকার ছিলেন এডউইন লুটিয়েনস।

ভালো কথা

ফেলনা

সেবার মামার বাড়িতে গিয়ে দাদার সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়ে একটা বাড়িতে দেখি উঠানে ছোটোরা খেলছে, তাদের সঙ্গে একটা বড়ো বাঁদরও খেলছে। ছেটোরা কেউ ভয় পাচ্ছে না। দাদার কথামতো আমি সাহস করে ওর কাছে যেতে আমার হাতটা ছুঁয়ে দিয়ে আবার খেলায় মেতে উঠল। খেলা মানে এমন ছোটোদের মধ্যে মনের আনন্দে ছোটাছুটি করছে। ওই বাড়ির ঠাকুমা বলল ওটা জন্মের পরই ওর মা ওকে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। আমি ওকে বড়ো করেছি। কিছু আনতে বললে নিয়ে আসে। কাউকে কামড়ায় না। আমার কাছে শোয়। বিছানা নোংরা করে না। কারো খাবার কেড়ে খায় না। ওর নাম ফেলনা। আমি ফেলনা বলে ডাকতেই আমার দিকে একবার তাকাল। ঠাকুমা বলল ভালোবাসলে কী না হয়।

অপর্ণা মাহাত, একাদশ শ্রেণী, বামনডি, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ণা গু দ রু	(১) যো কা ণি গ ঞ্চ ম ন
(২) চ চা ল ল	(২) সা স ন্ব ম ধ য় ন

১৭ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) মনমেজাজ (২) ভিত্তিপ্রস্তর

১৭ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) যাত্রীসহায়তা (২) রাত্রিজাগরণ

উত্তরদাতার নাম

(১) দীপান্বিতা সরকার, রাজনগর,কালিয়াচক, মালদা। (২) শুভম সরকার, বেলঘড়িয়া, কল-৫৬ (৩) শ্রেয়া দাস, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার (৪) পূজা সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

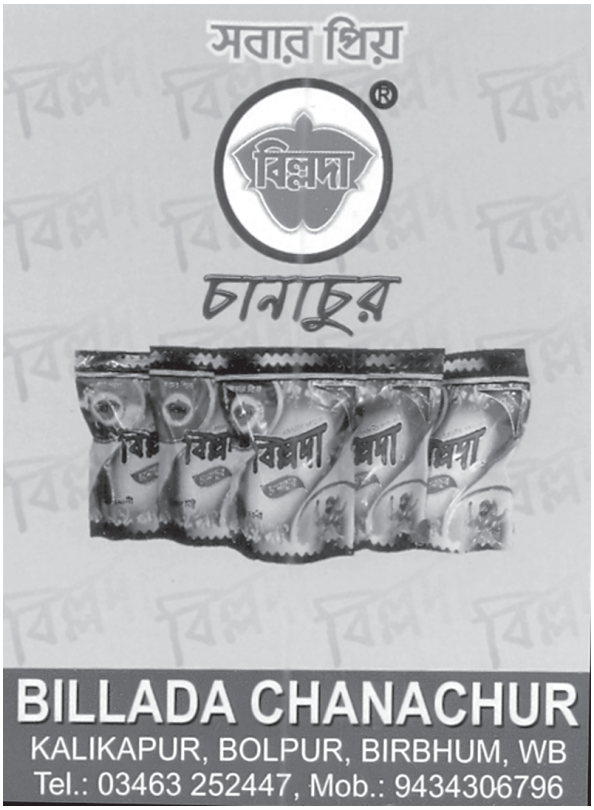

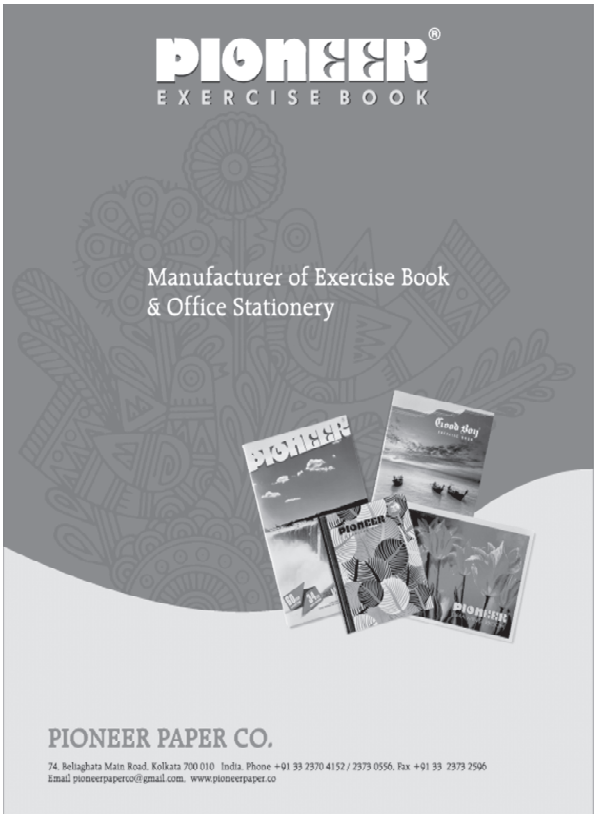

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

স্বাধীনতা আন্দোলনে ত্রিপুরার অবদান

পান্নালাল রায়

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরায় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। তারও আগে মহা বিদ্রোহের ছোঁয়া লেগেছিল ত্রিপুরায়। এদিকে ১৯৪২-৪৩ সালে রতনমণি নামে এক সাধুর নেতৃত্বে ত্রিপুরায় ঘটেছিল রিয়াং বিদ্রোহ, যা পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা পেয়েছে।

১৮৫৭ সালের মহা বিদ্রোহকে বলা হয়ে থাকে দেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। সেদিন দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরায় এর আঁচ লেগেছিল। ১৮৫৭ সালের ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রামের ৩৪নং পদাতিক বাহিনীর ভারতীয় সিপাহিরা বিদ্রোহ করে ত্রিপুরার দিকে অগ্রসর হয়। হয়তো স্বাধীন রাজ্য পার্বত্য ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিয়ে কোনো বিশেষ পরিকল্পনা কার্যকর করতে চেয়েছিল তারা। সেসময় কুমিল্লায় অবস্থানরত ভারতীয় সিপাহিদের বিদ্রোহে শামিল করার পরিকল্পনাও হয়তো তাদের ছিল। কিন্তু ত্রিপুরার রাজা চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহিদের বহিষ্কারের আদেশ দেন। বিদ্রোহীরা তারপর মণিপুরের উদ্দেশে শ্রীহট্ট-কাছাড় অভিমুখে যাত্রা করে। তারা মণিপুরের রাজার সাহায্য পাবে— এমনই তাদের একটা আশা ছিল। কিন্তু ত্রিপুরার রাজাদেশ অগ্রাহ্য করে কয়েকজন সিপাহি আগরতলার কাছাকাছি কোনো এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিল। রাজার বাহিনী তাদের গ্রেপ্তার করে কুমিল্লায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠায়। সেখানে তাদের ফাঁসি হয়।

সে সময় ত্রিপুরার সিংহাসনে ঈশানচন্দ্র মাণিক্য। পার্বত্য ত্রিপুরায় রাজার তথাকথিত স্বাধীন সত্তা থাকলেও সমতল ত্রিপুরা তথা চাকলা রোশনাবাদে রাজা ছিলেন ইংরেজ অধীনস্থ এক জমিদার। সিংহাসনে আরোহণের জন্য রাজার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খেলাত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। এছাড়া রাজাকে ইংরেজরা নানাভাবে চাপের মধ্যেও রাখত। রাজাদের রাজ্যচ্যুতির ভয়ও থাকত। এরকম অবস্থায় ত্রিপুরার রাজা যে বিদ্রোহী সিপাহিদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন না তা সহজেই অনুমেয়। রাজা সিপাহিদের বিদ্রোহের ছোঁয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন এটাই যেন স্বাভাবিক। কিন্তু তার পরও ঈশানচন্দ্র ইংরেজদের কোপানলে পড়েছিলেন। তিনি তাদের সন্দেহ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। ইংরেজরা রাজাকে বিদ্রোহীদের সাহায্যকারী

হিসেবে অভিযুক্ত করে ত্রিপুরা দখল করা-সহ রাজাকে কারারুদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়। অবশ্য শেষপর্যন্ত তা আর ঘটেনি। বিদ্রোহী সিপাহিরা ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের ভেতর দিয়ে সিলেট হয়ে কাছাড়ের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। ত্রিপুরায় ব্যর্থ হয়ে বিদ্রোহীরা মণিপুরের রাজার সাহায্য প্রত্যাশী হয়। কিন্তু কাছাড়েই ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে বেশিরভাগ বিদ্রোহী সিপাহির মৃত্যু ঘটে। নির্বাপিত হয় বিদ্রোহের মশাল। কাছাড়ে অবশ্য মণিপুরের রাজকুমার নরেন্দ্রজিৎ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি গুরুতর আহত হন। শেষে মণিপুরে আত্মগোপন করে থাকা অবস্থায় তিনি রাজকীয় বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। এদিকে বিদ্রোহী সিপাহিদের প্রতি ত্রিপুরার রাজার ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ত্রিপুরার সাধারণ পার্বত্য প্রজারা যে বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। বিদ্রোহীরা ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে উত্তর দিকে গিয়েছিল। পার্বত্য অঞ্চলের জনজাতিরা তখন তাদের সাময়িক আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিল।

নৃপতি শাসিত দেশীয় রাজ্য পার্বত্য ত্রিপুরায় ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন না ঘটলেও রাজার জমিদারি চাকলা রোশনাবাদ এলাকায় তা ঘটেছিল। কারণ তা ছিল ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই এই অঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলনের ছোঁয়া লেগেছিল পার্বত্য ত্রিপুরায়। এদিকে ত্রিপুরার রাজাদেরও কেউ কেউ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নীরব সমর্থক ছিলেন। তখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও রাখি বন্ধন উৎসবের প্রভাব পড়েছিল আগরতলায়। ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির সংবাদে রাজপরিবারের অনেকেই শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে তদানীন্তন রাজা রাধাকিশোর মাণিক্যও বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। চারণ কবি মুকুন্দ দাস আগরতলায় এসে গান গেয়ে দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত করেছিলেন সবাইকে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় ঢাকায় জন্ম নিয়েছিল অনুশীলন সমিতি। সেই সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে সেদিন পার্বত্য ত্রিপুরার উদয়পুর ও বিলোনীয়ায় দুটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল।

বাইরে থেকে দেখতে এগুলো খামার বাড়ির মতো মনে হলেও তা ছিল বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। দিনে ছিল চাষবাস আর রাতে নিকটবর্তী জঙ্গলে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

পার্শ্ববর্তী ব্রিটিশ এলাকার বিপ্লবীরা অনেক সময় পালিয়ে এসে ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতেন। এইভাবে ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল ত্রিপুরাও। বিপ্লবীদের প্রতি রাজার গোপন সহানুভূতি ছিল বলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রায়ই ত্রিপুরার রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ করত। বিপ্লবীদের প্রতি রাজ সরকারের নৈতিক সমর্থনও থাকত বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।

কালক্রমে পার্বত্য ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বদেশীদের তৎপরতা ছড়িয়ে পড়ে। প্রভাব পড়ে অসহযোগ আন্দোলনের। চাঁদপুরে অসহায় চা শ্রমিকদের উপর ব্রিটিশ পুলিশের হামলার প্রতিবাদে যে রেল ধর্মঘট হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে আখাউড়ায় হরতাল পালিত হয়, আগরতলায় বাজার বয়কটের ডাক দেয়া হয়। বিলোনীয়া, ধর্মনগর, কৈলাসহরে অসহযোগ আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে। বিভিন্ন অঞ্চলে সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার সীমান্তে যাতে এ ধরনের তৎপরতা, সভা-সমাবেশ না হতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও ত্রিপুরার রাজ্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। সরকারি বিচার বিভাগকে বয়কট করার উদ্দেশ্যে কৈলাসহরে একটি সভা ডাকা হলে ত্রিপুরা সরকার তা বন্ধ করে দেয়। এদিকে ১৯২২ সালে আগরতলার রাজপ্রাসাদের অস্ত্রাগার থেকে চট্টগ্রামের বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেনের সহযোগী অনন্ত সিংহ স্থানীয় বিপ্লবীদের সহযোগিতায় বহু সংখ্যক পিস্তলের গুলি সংগ্রহ করেন। আগরতলায় অনুশীলন সমিতির যে শাখা স্থাপিত হয় তার প্রধান কাজ ছিল ব্রিটিশ এলাকা থেকে পুলিশের তাড়া খেয়ে আসা বিপ্লবীদের ত্রিপুরায় আশ্রয় দান-সহ গোপন যোগাযোগে সহায়তা করা। অনুশীলন সমিতির তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে বেশ কয়েকজনকে বন্দি করা হয়।

১৯২৮ সালে ত্রিপুরায় জন্ম নেয় ভ্রাতৃসঙ্ঘ। শরীর চর্চা ও সাংস্কৃতিক সংস্থা পরিচয়ে এটি গঠিত হলেও মূলত ভ্রাতৃসঙ্ঘ ছিল ত্রিপুরায় বিপ্লবীদের প্রধান আখড়া। ভ্রাতৃসঙ্ঘের শাখা ছড়িয়ে পড়েছিল রাজ্যের সর্বত্র। প্রকাশ্যে সমাজসেবামূলক কাজ করলেও গোপনে ছিল তাদের বিপ্লবী তৎপরতা। দূরবর্তী স্থানে তাদের আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল। ত্রিপুরায় বিপ্লবীদের যে নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে তার মধ্যে রয়েছে উপেন্দ্র চন্দ্র লস্কর, রাসমোহন ভট্টাচার্য, নারায়ণ ব্যানার্জি, কুঞ্জেশ্বর দেববর্মা, প্রশান্ত কুমার দেববর্মণ, প্রফুল্ল কুমার বসু, শচীন্দ্র লাল সিংহ, উমেশলাল সিংহ, বীরেন দত্ত, সুকুমার ভৌমিক, ধীরেন্দ্র দত্ত, গোপাল দত্ত, জীতেন্দ্র দত্ত, অনন্ত দে, অনন্ত দেববর্মা, বঙ্কিম চক্রবর্তী, সুশীল কুমার দেববর্মা, মণি বিশ্বাস, ক্ষীরোদ সেন, হরিগঙ্গা বসাক, নলিনী সেনগুপ্ত, অনন্ত কুমার দে প্রমুখ। বলাই বাহুল্য, এই তালিকা আরও দীর্ঘ হবে। আরও অনেকেই রয়ে গেছেন অন্তরালে। সেদিন ত্রিপুরার বিপ্লবীদের অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাদের কেউ কেউ আন্দামানের সেলুলার জেলেও বন্দি ছিলেন।

১৯৪২-৪৩ সালে ঘটেছিল রিয়াং বিদ্রোহ। সামন্ততান্ত্রিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ঘটলেও সে সময় অনেক ক্ষেত্রে রতনমণির শিষ্যদের স্বদেশি বলে অভিহিত করা হতো। পরবর্তী সময়ে এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠীর সর্দারদের বলা হতো চৌধুরী। এরা কার্যত সামন্ত প্রভুদের মতো আচরণ করতেন। জোর করে অর্থ আদায়, জরিমানা করা ইত্যাদি নানাভাবে তারা অত্যাচার চালাতেন রিয়াং প্রজাদের উপর। রাজার কাছ থেকেও তাদের এ অবস্থার প্রতিকারের পথ ছিল না। এ অবস্থায় ক্ষুব্ধ রিয়াং প্রজারা ভেতরে ভেতরে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল। এরকম সময়েই রতনমণি নামে এক সাধুর আবির্ভাব ঘটে। তিনি লোকমান সাধু নামে সাধারণের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। ত্রিপুরায় রিয়াং ও নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ দলে দলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। শিষ্যদের মন্ত্র দেওয়ার পাশাপাশি তিনি রামায়ণ, মহাভারত-সহ পুরাণের নানা গল্প বলে তাদের মধ্যে স্বাভিমানবোধ সঞ্চার করতেন। এইভাবে পার্বত্য এলাকার প্রজাদের মধ্যে রতনমণির প্রভাব দিন দিন বাড়তে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর আশ্রম গড়ে উঠতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ত্রিপুরায় তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দেয়। দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। রতনমণির শিষ্যরা তখন দরিদ্র জনজাতিদের পরিত্রাণে এগিয়ে আসে। নানা স্থানে ধর্মগোলা স্থাপন করে খাদ্য বিতরণ শুরু করে তারা। এদিকে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশদের সহায়তার জন্য পার্বত্য এলাকা থেকে সৈন্য সংগ্রহের নির্দেশ দেন রাজা। আর তা কেন্দ্র করে চৌধুরীদের সঙ্গে রতনমণির শিষ্যদের বিরোধ বাধে। একদিকে খাদ্যসংকট, সৈন্য সংগ্রহকে কেন্দ্র করে চৌধুরীদের অত্যাচার সব মিলিয়ে যেন ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে প্রজাদের। রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং প্রজাদের আন্দোলন শুরু হয়। তৈরি হয় সশস্ত্র দল। একসময় রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং প্রজা-বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করে। রাজা এবং পাশাপাশি এলাকার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই বিদ্রোহে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই বিদ্রোহ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রাজকীয় বাহিনী নির্মমভাবে দমন পীড়ন চালিয়ে এই বিদ্রোহ গুড়িয়ে দেয়। হাজার হাজার রিয়াং বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এমনকী নারী, শিশুও তা থেকে রেহাই পায়নি। রতনমণি সীমান্ত পেরিয়ে চট্টগ্রামে চলে গেলে ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে রাজসরকারের হাতে তুলে দেয়। আগরতলায় রাজপ্রাসাদে জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাকে শারীরিক নির্যাতন করা হয় এবং তার ফলেই রতনমণির মৃত্যু ঘটে। অবশ্য রাজসরকার থেকে প্রচার করা হয় যে, কোনো কঠিন রোগে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। সেদিনের বিদ্রোহের মশাল নির্বাপিত হলেও রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং বিদ্রোহ উজ্জ্বল হয়ে আছে ত্রিপুরার ইতিহাসে।

ত্রিপুরার মানুষ বরাবরই স্বাধীনচেতা। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় যেমন তারা এর নীরব সমর্থক ছিলেন, তেমনি পরবর্তী সময়ে যখন ব্রিটিশ বাঙ্গলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ছোঁয়া লাগে পার্বত্য ত্রিপুরায় তখনও এখানে শুরু হয় বিপ্লবী তৎপরতা। এমনকী সেসময়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেও গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটতে শুরু করে। রতনমণি নামে এক সাধুর নেতৃত্বে ঘটে যাওয়া প্রজাদের বিদ্রোহ আজ দেশের বৃহত্তর অঙ্গনে স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা পেয়েছে। □

নেতাজী জন্মদিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস ও ইন্ডিয়া গেটের ফাঁকফোকর

সাধারণতন্ত্র দিবসে এই প্রথম হয়তো ভারতবর্ষ মেরুদণ্ড সোজা রেখে ঔপনিবেশিক প্রভুর ফেলে যাওয়া তল্পিবাহকদের গোপন আধিপত্যকে গুঁড়িয়ে দিল।

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত জানুয়ারি মাসটি চিরকালই আমাদের দেশে একটি গৌরবোজ্জ্বল মাস। এই মাসেই জন্ম নিয়েছিলেন ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর দেশপ্রেমিক তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। আর এই মাসেই দেশ সরকারিভাবে গণতান্ত্রিক ভারত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিষয় দুটি সকলেরই জানা। কিন্তু এই বছর হঠাৎ এই অবিস্মরণীয় তারিখগুলি নিয়ে নীচু মানের রাজনীতি শুরু হয়ে গেল।

সুভাষচন্দ্র যিনি তাঁর কর্মজীবনে নিজের প্রবাদপ্রতিম ওজস্বিতা ও অনমনীয় চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে অমরত্বের শিখর স্পর্শ করেছেন, তাঁকে নিয়ে এক দফা রাজনৈতিক লাভ তোলার অপচেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উৎকট নেতাজী ভক্তি প্রদর্শনের খবরে তাঁর চিরকেলে কপট চরিত্রের কথা স্মরণে এসে গেল। দিল্লিতে ইন্ডিয়া গেটের কাছেই নেতাজীর বিশাল গ্রানাইট পাথরের মূর্তি স্থাপন হবে। ইতিমধ্যে হলোগ্রাম ও লেজার আলোর মাধ্যমে তাঁর মূর্তির অস্থায়ী উন্মোচনও হয়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে ২৬ জানুয়ারির সাধারণতন্ত্র দিবসে প্রদর্শনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো কেন্দ্রীয় কমিটির মনোনীত হয়নি। মমতাদেবীর বক্তব্য, সরকার এরই খেসারত দিতে নেতাজী মূর্তি স্থাপনের প্রস্তাব নিয়েছে। ধন্যি মেয়ের অধ্যবসায়! তিনি নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন যে ৭৫ থেকে ৭৭ সালের জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে যে জনবিক্ষোভ হয়েছিল তার নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। তিনি যখন কলকাতার সভায় বক্তৃতা দিতে আসেন সেসময় কংগ্রেসি গুন্ডা বাহিনীর সদস্যা হিসেবে জয়প্রকাশ নারায়ণের গাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছিলেন এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই।

এরপর ব্যাপক গণ-আন্দোলনের প্রভাবে নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীকে পরাজিত করে জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসে। এই সরকার জানত শ্রীমতী গান্ধী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভারত ইতিহাসের একটি ক্যাপসুল বিশাল ইস্পাত মোড়কে ভরে মাটির গভীরে পুঁতে দিয়েছেন। কাজটা কিছু খারাপ ছিল না। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেলে পরবর্তী কোনো প্রজন্মের মানুষ ভারতের কথা জানতে পারবে। কিন্তু নামের পাশে ছিল ছদ্ম গান্ধী পদবি ও কংগ্রেসের সংস্কৃতি। নতুন সরকার কবর খুঁড়ে ইতিহাসের প্রোথিত দলিল উত্তোলন করে। যেখানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং পরবর্তী ২৮ বছরের যে ইতিহাস কবরস্থ হয়েছিল সেখানে নেতাজীর কলকাতা থেকে মহানিষ্ক্রমণের পর ৩৫০০০ কিলোমিটারের যুদ্ধযাত্রা ও জীবন বাজি রাখার কোনো উল্লেখ ছিল না। ছিল শুধুই মোতিলাল, জওহরলাল, ইন্দিরা ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষক অহিংসার পূজারির অবদানের এলাহি ইতিহাস। এই সংবাদ তখন টিভি ছাড়াই হাজার হাজার সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকায় ব্যাপক সম্প্রচারিত হয়ে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল। মমতাদেবী তখন নেহাত শিশু ছিলেন না, ছিলেন তৎকালীন কংগ্রেসের যুবনেত্রী। তিনি কি নেতাজীর প্রতি এই অবহেলা, অসম্মানের কোনো প্রতিবাদ করেছিলেন? অবশ্যই করেননি। কেননা এই কুকর্মের হোতা তাঁর আরাধ্য দল কংগ্রেসই তো ছিল। আজ তাঁর দরদ উথলে উঠেছে। আবার প্রকট হয়েছে তাঁর কপট রাজনৈতিক জীবনের একটি কলঙ্কময় অধ্যায়।

ইতিমধ্যে নেতাজীর জন্মদিনে আরও একটি সুপরিকল্পিত কাজ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এতকাল ইন্ডিয়া গেটে দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া সৈনিকদের স্মরণে যে 'অমর জওয়ান জ্যোতি' প্রজ্বলিত ছিল সেটিকে এই সরকার বলিদানী সৈনিকদের স্মৃতিবিজড়িত ওয়ার মেমোরিয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। এখানেও বিতর্ক ওই জ্যোতি কেন নির্বাপিত হলো। যাঁরা ওই ১৯৭২-এ যুদ্ধের পর নিহত সৈনিকদের স্মরণে নির্মিত 'অমর জওয়ান জ্যোতি' সংলগ্ন ইন্ডিয়া গেট পরিদর্শন করেছেন সেখানে ৭২-এর যুদ্ধ বা স্বাধীন ভারতের হয়ে অন্য যুদ্ধ, সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ দেওয়া, আপৎকালীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা কারুর নাম নেই। সরকারের নবনির্মিত যুদ্ধস্মারক স্থলে প্রতিটি সৈনিকের নাম-ধাম-প্রদেশের বিশদ উল্লেখ রয়েছে। পর্যাপ্ত সংস্থান রাখা হয়েছে ভবিষ্যতের এমনই ভারতমাতার বীর সন্তানদের জন্যও।

এবার একটা ধাঁধা আছে। যে ইন্ডিয়া গেট চত্বর নিয়ে এত হট্টগোল সেখানে ১৩ হাজার বলিদানী ভারতীয় সৈনিকের নাম লেখা আছে। তাঁরা কিন্তু পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির হয়ে ইংরেজের শাসন নিরাপদ রাখতে নিজেদের প্রাণ দিয়েছিলেন। এখন যে কারুরই এমনটা মনে হতে পারে তবে কি ভারতের যুদ্ধ ইতিহাস সেই ১৯১৪-১৮ সালে মৃত সৈনিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ওয়ার মেমোরিয়ালে স্থানান্তর এই ধাঁধার জবাব দেবে।

সেখানে সকলের নাম থাকবে। কিন্তু আরও একটি ছলনাময় ঘটনা এই সূত্রে আলোচনায় আসতে পারে। ইন্ডিয়া গেটে পরাধীন ভারতের যে সমস্ত সৈনিকের নাম রয়েছে তাদের ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেছিলেন অহিংসার পূজারি গান্ধীজী। এটি বলার স্পর্ধা আমার থাকার কথা নয়, কেননা একথা বলেছেন CF Andrews যিনি বিশিষ্ট ইংরেজ যাজক, আমরা যাকে দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ বলি। তিনি সেই হাতে গোনা ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন যিনি গান্ধীকে 'মোহন' বলে ডাকার অধিকারপ্রাপ্ত। তিনি সরাসরি গান্ধীকে বলেছিলেন তোমার অহিংসার নীতি দ্বিচারিতায় ভরা। তুমি অহিংসা প্রচার করো, আবার বন্দুক নিয়ে লোককে সৈনিক হতে বলো কী করে? এ তো চরম দ্বিচারিতা। এবারের নেতাজীর জন্মদিন ও সাধারণতন্ত্র দিবস এমনই সব দ্বিচারিতা ও কপটতাকে প্রকট করে তুলল। সত্য চাপা থাকে না বলে যে চিরকালীন প্রবাদ আছে কালক্রমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী, গান্ধীজী ও কংগ্রেসের প্রকৃত ভূমিকার উন্মোচন তা প্রমাণ করবে। এই কারণেই বিশিষ্ট পরিবারটি এত উদ্বেগাক্রান্ত হয়ে পড়ছে।

নেতাজীর মহিমামণ্ডিত মূর্তি স্থাপন ও দেশবাসীর মধ্যে গত কয়েক বছরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের যে সত্য ধারণা এতদিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার কারণেও ছদ্ম গান্ধী পরিবার গভীর চিন্তিত। আজ মানুষ জানতে পারছে ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষ (১৫৭৫) সীতারামাইয়াকে (১৩৪৬) হারিয়ে সভাপতি হওয়ার পরও গান্ধী তাঁকে হীন কৌশলে ওই দ্বিচারিতার প্রয়োগে বিতাড়িত করেন। নির্বাচিত সভাপতি (রাষ্ট্রপতি) তাঁর মনোনীত সদস্য নিতে পারবেন না, অহিংসার পুজারির চাটুকারদের নিতে হবে। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন তিনি স্বাধীনতা ভিক্ষা করে নেবেন না, তা ছিনিয়ে নেবেন। নীচতার কাছে মাথা না নত করে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে জীবন- মরণ লড়াইয়ে বিশ্ব পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন। খুবই নামকরা বামপন্থী মনোভাবাপন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক শ্যাম বেনেগাল The Forgotten Hero বলে নেতাজীর ওপর একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি বানান। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন সুভাষচন্দ্র একজন হিরো কিন্তু তিনি ভুলে যাওয়া বা ভুলিয়ে দেওয়া হিরো। তিনি ৬০ হাজার সৈন্য-সহ বিদেশে স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৪ সালে সসৈন্যে ব্রিটিশ ভারতের জঙ্গলাকীর্ণ মণিপুরের পথ অতিক্রম করে মৈরাঙে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করিয়েছিলেন।

এবারের এই ওয়ার মেমোরিয়াল, অমর জওয়ান জ্যোতি বিতর্ক সত্যের উৎসমুখ খুলে দিয়েছে। তাঁকে পূর্ণ সরকারি মর্যাদায় এই প্রথম গ্রহণ করা হয়েছে। মোদী অবশ্য তাঁকে আগেই স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছেন। নেতাজীর মহাসংগ্রামের কথা অনেক উৎসাহী মানুষ জানেন কিন্তু সেই জানাটা অনেক ক্ষেত্রেই গবেষণাধর্মী হয়ে আছে। আইএনএ-এর ২৬ হাজার সৈন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। একথা আমরা ক'জন জানি? এই সব দেশপ্রেমের অমরকাহিনি বিদ্যালয় স্তর থেকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সময় এসে গেছে। যেখানে শুধুমাত্র অহিংসা ও ব্রিটিশ পূজারির কথায় পাতা ভর্তি না করে জীবনমৃত্যু আক্ষরিক অর্থেই পায়ের ভৃত্য করা ভুলে যাওয়া নায়কদের কথা লেখা দরকার।

ইংরেজ পূজক বলার কারণ ইতিহাসে কংগ্রেসি সীতারামাইয়া মৌলানা আজাদ, নির্মল বসু প্রভৃতিদের বহু নির্মোহ বিশ্লেষণ লেখায় পাওয়া যাবে। চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে এলেই বিশ্বকে বিভ্রান্ত করা ও বিপুল জনপ্রিয় Richard Attenborough'র 'গান্ধী' চলচ্চিত্রের কথা আসবেই। সেখানে কী মমতায় তাঁর চরিত্রটিকে গৌরবান্বিত করা হয়েছে। যেখানে দীর্ঘ অহিংস (তথাকথিত সংগ্রাম) ও সহিংস সংগ্রাম, অগণিত বিপ্লবীর ইংরেজের হাতে মৃত্যু কিছুই খুঁজে পাবেন না। বহু নেতার সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও ভগৎ সিংহ, শুকদেব, রাজগুরুর ফাঁসি মকুবের জন্য একটি আবেদনও গান্ধী ইংরেজের কাছে করেননি। সুভাষকে spoilt child বলা থেকে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী মাস্টারদা সূর্য সেন তাঁর খাতায় গুন্ডা। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, আজাদ হিন্দের ভারত অভিযান সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে ইংরেজ পরিচালক গান্ধী চলচ্চিত্রে বিশ্ববাসীকে একটি মিথ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস উপস্থাপনা করে গান্ধীকে অন্যায়ভাবে larger than life ভাবমূর্তিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। গান্ধী তাঁর life time achievement-এর পুরস্কার তো চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পেয়েই গেলেন। তবুও তাঁর উত্তরাধিকারের ট্র্যাডিশন আজও প্রবহমান।

এই প্রবহমানতা যে এখনও কতটা খরস্রোতা তা হঠাৎ প্রকাশ্যে এসে গেছে। দেশের সেনাবাহিনী সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের পর প্রথা মেনে কয়েকদিন পর রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে স্বস্থানে ফিরে যায়। ইংরেজের দিয়ে যাওয়া এই উলটোরথের মতো প্রথার নাম বিটিং রিট্রিট'। এই সময় তারা তাদের বাদ্যযন্ত্রে যে সুর বাজিয়ে আসছে তার সবই বিলিতি প্রভুর অনুমোদনপ্রাপ্ত। চালতা হ্যায় সংস্কৃতিতে চলে আসছে। কিন্তু এর মধ্যেও ঢুকে রয়েছেন জাতির তথাকথিত জনক গান্ধীজী। সামরিক ব্যান্ডে একটি গানের সুর বাজানো হয়— যার নাম 'abi de with me', এটি নাকি জাতির জনকের অন্তরের খুব কাছাকছি। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির কী ভয়ানক দাপট! গানটি লেখা হয়েছিল ১৮৪৭ সালে অর্থাৎ ১৭৫ বছর আগে, তখনও প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ জ্বলেনি। এই খ্রিস্টীয় সংগীতটি ভারতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। অথচ মহাত্মাজীর এত প্রিয় ছিল যে আজও কেউ বদলাবার সাহস দেখাননি। ২০২০ ও ২১ সালে এটি সরকার বদল করতে চাইলেও নানাদিকের বাধায় সম্ভব হয়নি। ভাবলে অবাক হবেন, এর পরিবর্ত হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল দেশীয় কবি প্রদীপ ও দরদি সুরকার সি রামচন্দ্রের অপরূপ সুরারোপিত ও লতা মঙ্গেশকরের অবিস্মরণীয় পরিবেশনে 'এ মেরে ওয়াতনকে লোগো জরা আঁখমেঁ ভরলো পানি...' গানটি।

১৯৬২ সালে চীনের কাছে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত অপরিণামদর্শিতার ফলস্বরূপ ৩২৫০ জন সৈন্যের জীবনের মূল্যেও ভারত চরম মার খায়। পরবর্তী ১৯৬৩ সালের গণতন্ত্র দিবসে লতাজী গানটি পরিবেশন করে সেদিনের শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। সব বাধা পেরিয়ে গানটি এই বছর থেকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একই সঙ্গে থাকবে আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ সংগীত 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' 'বীর সৈনিক' প্রভৃতির মতো আরও ২৪টি ভারতের আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, স্বপ্নের প্রতিরূপ বহনকারী সহজবোধ্য বিভিন্ন প্রদেশের গান। এই প্রথা বিচ্যুতির প্রচেষ্টাকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হলেও গানগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত দেশের মাটির গন্ধ সমস্ত অপচেষ্টাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। সাধারণতন্ত্র দিবসে এই প্রথম হয়তো ভারতবর্ষ মেরুদণ্ড সোজা রেখে ঔপনিবেশিক প্রভুর ফেলে যাওয়া তল্পিবাহকদের গোপন আধিপত্যকে গুঁড়িয়ে দিল। □

ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন সুমন

সুষমা ভট্টাচার্য

‘যা করেছেন তা, বেশ করেছেন। দরকার হলেই আবার এমন করতে পারেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সুমন চট্টোপাধ্যায় ওরফে কবির সুমন ওরফে গানওয়ালা এমন একটি পোস্ট করলেন এক সাংবাদিককে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার পর ক্ষমা চাইতে গিয়ে। অনেক যুক্তি, নানা কথার জাল বুনে তিনি ক্ষমা চাইলেন। তিনি নাকি ভারতীয় গণতন্ত্রে একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি নাকি জীবনের জন্য গান গেয়ে থাকেন, তিনি নাকি এক সময়ে সাংবাদিক ছিলেন। তিনি নাকি কবি। আসলে তিনি একজন উন্নাসিক, উদ্ধত মানুষ যে তাঁর নিজের জাতিকে সম্মান করে না। সমাজের কলঙ্ক বললে ভুল বা অন্যায় নয়।

যারা সাংবাদিকতা করেন, তাঁরা একটু মতামত নেবার জন্য অনেককেই ফোন করে থাকেন। একটি বেসরকারি সংবাদমাধ্যমের একজন রিপোর্টার (সুমনের সন্তানতুল্য) সামান্য একটি রিঅ্যাকশন জানার জন্য ফোন করেছিলেন সুমনকে। সেটাই তাঁর অন্যায়। তিনি ওই সংবাদমাধ্যমকে পছন্দ নাই করতে পারেন। একটি কথায় বলতে পারতেন, এই সংবাদমাধ্যমে কোনো কথা বলবেন না। ব্যাস, এখানেই শেষ। তা না করে তিনি যে ভাষায় ওই সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিকে আক্রমণ করলেন তা একজন শিক্ষিত (বলা উচিত শিক্ষিত শব্দ ব্যবহারের কলঙ্ক) মানুষের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

তাঁর সংগীত জীবন ও প্রতিভা নিয়ে শ্রদ্ধা জানাতেই হয়। কিন্তু ব্যক্তি জীবন নিয়ে যতটা অশ্রদ্ধা করা যায়, সেটা কম। বিদেশে থেকে বিয়ে করেন, সেই স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার এবং ত্যাগ করার ঘটনা

সংবাদমাধ্যমে এসেছিল ফলাও করে। বাংলাদেশের গায়িকা সাবিনা ইয়াসমিনকে বিয়ে করার জন্য ধর্ম পরিবর্তন-সহ নানা ঘটনা তিনি ঘটিয়েছেন। একাধিক বিয়ে নিয়েও তাঁর সুনাম সর্বজন শ্রাব্য। আবার তিনি রাজ্যের শাসক দলের একজন এলিট তালিকার বুদ্ধিজীবী। তিনিই এক ভাষা সহযোগে কতটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন, সেটা জেনে গেছেন আপামর জনগণ। তিনি পদলেহনে যে পারদর্শী, সেটা রাজনীতিতে আসার সময়েই পরিষ্কার প্রমাণিত। সেই পদলেহনের পুরস্কার হিসেবে ২০০৯ সালে যাদবপুরের সাংসদ।

সেই সময় থেকেই ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়াতে শুরু করে। ক্ষমতার দম্ভে তিনি দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নানা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন। প্রচারের আলোয় থাকতে পছন্দ করা এই মানুষটি যে কোনো বিতর্ক তৈরি করেই প্রচারের আলোতে চলে আসতে যে কোনো পন্থা বেছে নিতে দেরি করেন না। বেশ কিছুদিন অন্ধকারে থাকার পর হঠাৎ হাজির হয়ে এহেন কাণ্ড ঘটাবেন, বুঝতে পারেনি তাঁর দল। এই বিষয় নিয়ে তাঁর দল তথা রাজ্যের শাসক দলের চুপ করে থাকার অর্থ, তারাও সুমনের এই কাজকে সমর্থন করছে পরোক্ষভাবে।

ওই সাংবাদিককে বরাহনন্দন সম্বোধন থেকে শুরু করে মাত্রা ছাড়িয়ে যান কটু কথার শব্দ বাণ ছাড়তে। একটি বাচ্ছা ছেলে, একজন শ্রদ্ধেয় মানুষের মুখের ভাষা শুনে কিছুটা হলেও সাময়িক ভাবে ভাষা হারিয়ে ফেলে। শ্রদ্ধেয় সুমন কি পাগল হয়ে গেলেন? নাকি তিনি অপ্রকৃতস্থ, একথা ভাবনার মধ্যে আনতে চাননি ওই সাংবাদিক। এমনকী সুমন বাঙ্গালিকেও ছাড়েননি তাঁর কটূক্তি থেকে। হয়তো তিনি কিছুদিন বিদেশে ছিলেন, হয়তো তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে একজন বাংলাদেশি নাগরিকের স্বামী, তাই হয়তো তাঁর বাঙ্গালির প্রতি একটা অন্য রকমের মন থাকতেই পারে।

সুমন হয়তো জানেন না যে একবার মুখের কথা বেরিয়ে গেলে আর তা ফেরত নেওয়া যায় না। আর তিনি যে গালাগাল দিয়েছিলেন সেটি তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। বলেছেন, ‘ভেবে দেখলাম সেদিন টেলিফোনে এক সহনাগরিককে যে গাল দিয়েছিলাম, সেটা সুশীল সমাজের নিরিখে গর্হিত কাজ। এতে কাজের কাজ কিছু হলো না, মাঝখান থেকে অনেকে রেগে গেলেন, উত্তেজিত হলেন। ‘তিনি কি ভেবেছিলেন যে সবাই পাশে দাঁড়িয়ে তাকে বাহবা দেবেন? সেকথা ভাবলে, একটাই উত্তর, ‘ছিঃ ছিঃ...’! পরের দিন একেবারে নির্লজ্জের মতো ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে নানা কথার জাল বুনে ক্ষমা চাইলেন। বাজারে একজন নির্দোষকে জুতো মেরে আড়ালে রসগোল্লা খাওয়ানোর মতো বিষয়।

আপনি সুমন যে কাজ করেছেন তা ক্ষমার অযোগ্য। সমস্ত সংবাদ জগতের প্রতিনিধি ও আপামর বাঙ্গালিকে অপমান করা ওই গানওয়ালাকে এখন থেকে বয়কট করা উচিত। রাস্তায় বেরলেই কালো পতাকা দেখিয়ে প্রতিবাদ করা উচিত। □

তামিলনাড়ুতে ধর্ম পরিবর্তনের মামলায় তদন্তের ভার সিবিআইকে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চেন্নাইয়ের সেক্রেড হার্ট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী এম. লাবণ্যের আত্মহত্যার মামলা নতুন মোড় নিল। অভিযোগ, সেক্রেড হার্ট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের কর্তৃপক্ষ এম. লাবণ্যকে হিন্দুধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার জন্য মাত্রাতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছিল। মানসিক অত্যাচারের অভিযোগও উঠেছিল। চাপ সহ্য করতে না পেরে ওই ছাত্রী আত্মহত্যা করেন। এই মামলা এতদিন মাদ্রাজ হাইকোর্টে বিচারাধীন ছিল। সম্প্রতি হাইকোর্ট মামলার তদন্তের ভার দিয়েছে সিবিআইকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তামিলনাড়ু সরকার অনেকদিন থেকে খ্রিস্টান মিশনারিদের স্বার্থরক্ষা করে আসছে। সেইজন্যেই, এম. লাবণ্য আত্মহত্যা করার পর তাঁর বাবা সঠিক এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন। কারণ মাদ্রাজ পুলিশের ওপর তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। সিবিআই তদন্তের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বিচারকেরা বলেছেন, এম. লাবণ্য সুইসাইড নোটে স্পষ্ট লিখেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ ধর্মান্তরণের জন্য তার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। সেই চাপ সহ্য করতে না পেরেই তিনি আত্মহত্যা করেন। অর্থাৎ এম. লাবণ্যের মৃত্যুতে স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা সন্দেহাতীত নয়। এই জন্যেই এই মামলার তদন্তের ভার সিবিআইকে দেওয়া হলো।

মালদহে মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করায় হিন্দু যুবককে পুলিশের মার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নেশা খাতুনকে বিয়ে করেছিলেন খোকন মণ্ডল। ভালোবাসার বিয়ে। আর তাতেই বেঁধে গেছে ধুন্ধুমার। পুলিশ খোকনকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে লকআপে ঢুকিয়ে বেধড়ক মারধর করে। ছাড় পাননি খোকনের বাড়ির লোকেরাও। খোকনের বাবা-মা পরিবারের অন্যান্য সদস্য— এমনকী প্রতিবেশীদের ওপরেও পুলিশ অত্যাচার করছে বলে অভিযোগ। খোকনের বাবা সেন্টুচন্দ্র মণ্ডল, দাদা মানিক মণ্ডল, ছোটোভাই কমল মণ্ডল এবং মা অঞ্জলি মণ্ডল এখন পুলিশি হেফাজতে। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের কালিয়াচকের বীরনগর গ্রামে। এই গ্রামের সরকারটোলার বাসিন্দা ২৬ বছরের হিন্দু যুবক খোকন মণ্ডল বি.এ. প্রথম বর্ষের ছাত্রী ২০ বছরের নেশা খাতুনের প্রেমে পড়ে। নেশা মুসলমান হলেও খোকনকে বিয়ে করতে তার কোনও আপত্তি ছিল না বলে জানা গেছে। কিন্তু বিয়ের পর নেশার পরিবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এবং নেশার পরিবারের প্ররোচনাতেই পুলিশ খোকনদের বাড়িতে চড়াও হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ যখন কোনও মুসলমান যুবক হিন্দু মেয়েকে ফুঁসলে নিয়ে যায় বা মিথ্যে ভালোবাসার প্রলোভন দেখিয়ে বিয়ে করে তখন পুলিশের এই সক্রিয়তা দেখা যায় না। অথচ এ ক্ষেত্রে পুলিশ শুধু সক্রিয়ই নয়, অতি সক্রিয়। পুলিশের অতি সক্রিয়তার পিছনে রাজনৈতিক ইন্ধন দেখছেন অনেকেই।

মা সি ক রা শি ফ ল

ফেব্রুয়ারি মাস (২০২২)

অধ্যাপক অমিত শাস্ত্রী

মেষ : কর্মস্থলে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা সমস্যা ও বদনাম হতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তিদের সঙ্গে কোনো অবৈধ্য সম্পর্কে জড়িয়ে যেতে পারেন। কার্যসিদ্ধির জন্য কূটবুদ্ধির প্রয়োগ করতে হতে পারে, তাই বিপদ যতই হোক না কেন তা কাটিয়ে উঠবেন, স্থানীয় বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে উঠবেন। মায়ের শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে পারে। উর্পাজনের জন্য কোনো ভিন্ন রাস্তা অবলম্বন করতে হতে পারে।

বৃষ : কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির দ্বারা সরকারি বা আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানে লাভ হতে পারে। তবে মাসের প্রথম দিকে কিছুটা সমস্যা হতে পারে। ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে ঝামেলা এড়িয়ে চলুন, লাভ হতে পারে। বাধার মধ্য দিয়ে নিজের প্রচেষ্টায় লাভ। পিতার শারীরিক কারণে উদ্বেগ বৃদ্ধি। ছোটোখাটো ভ্রমণ হতে পারে।

মিথুন : মাসের প্রথম দিক পিতার সঙ্গে মতপার্থক্য এড়িয়ে চলুন, শেষ ভাগে কোনো বিশেষ কাজের জন্য স্বীকৃতি লাভ। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির ব্যাপারে অশান্তি এবং বন্ধুর সাহায্যে বাধার মধ্য দিয়ে উন্নতি লাভ। উচ্চশিক্ষার যোগাযোগ হতে পারে। কোনো বিশেষ ব্যাপারে অর্থ বিনিয়োগ করে লাভবান হতে পারেন। আর্থিক ব্যাপারে অনিশ্চয়তা ও ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলুন।

কর্কট : কোনো বিশেষ ব্যাপারে মানসিক উদ্বেগ, চোখ বা হৃদরোগের সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। যাদের অনেকদিন লোন আটকে তারা লোন পেতে পারেন। যাদের মামলা চলছে উকিলের অবহেলার জন্য মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। অতিরিক্ত আমোদ প্রমোদের জন্য স্বাস্থ্যহানি। বৈবাহিক ব্যাপারে সমস্যা আসতে পারে।

সিংহ : অংশীদারি কারবারে পার্টনারের সঙ্গে মতবিরোধ এবং ফাটকায় লাভ। কোনো বিশেষ ব্যাপারে মানসিক চাঞ্চলতা, শত্রুতা সত্ত্বেও জাতক সমস্ত বাধা কাটিয়ে এগিয়ে যাবে। প্রেমঘটিত ব্যাপারে মানসিক অশান্তি, জাতক কঠিন পরিশ্রমিক পাবে না। শত্রুতা হতে সাবধানে চলুন।

কন্যা : সন্তানের কারণে মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি। বাড়ির ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্ত হতে পারেন। শারীরিক স্বাস্থ্যহানি। পড়াশোনায় মানসিক অশান্তিতে ভুগতে পারেন। কোনো মহিলা দ্বারা শত্রুতা, তবে নিজের উপর আস্থা রাখুন, সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। স্থানীয় কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন।

তুলা : পিতার অর্থ বা সম্পত্তি নাশ। মাসের প্রথম দিকে মায়ের কারণে উন্নতিতে বাধা। তবে ভাই, বোন বা আত্মীয়দের সহযোগিতা লাভ করতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে শান্তি। বিবাদে জয়লাভ ও সহযোগিতা লাভ করবেন। নিজের প্রচেষ্টায় যে কোনো সমস্যার সমাধান। কর্মের ব্যাপারে ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ।

বৃশ্চিক : অতিমাত্রায় অহংকারের জন্য মানসিক সামঞ্জস্যের অভাব আসবে। যানবাহন বা গৃহ বা জমি হতে অর্থলাভ। সাহসী কাজের মাধ্যমে ব্যবসায়ে বৃদ্ধি। অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা উপকার এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সুনজরে আসা। তবে অসাবধানতার জন্য বিপাকে পড়তে পারেন, অর্থ নষ্ট হতে পারে। পিতার স্বাস্থ্য সমস্যা আসতে পারে।

ধনু : আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যে কোনো কাজ সম্পন্ন করুন, তবে মাঝে মধ্যে হঠকারিতার স্বীকার হতে পারেন। অর্থের অপচয় হতে পারে। মাসের শেষের দিকে সরকারি বা আধাসরকারি কাজের মধ্য দিয়ে অর্থ উপার্জিত হতে পারে। ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, সাবধানতা অবলম্বন করুন। প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে অথবা সন্তানের ব্যাপারে সুখ লাভ।

মকর : অসতর্কতামূলক কথাবার্তার জন্য শত্রুতা বৃদ্ধি। শান্ত স্বভাবের দ্বারা সমস্যার সমাধান করুন। মাসের প্রথমার্ধে শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে, ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ। দাম্পত্যজীবনে অশান্তি এড়িয়ে চলুন।

কুম্ভ : সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখতে গিয়ে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি। শরীরের প্রতি যত্নবান হোন। পড়াশোনার ব্যাপারে ক্ষতি, বুদ্ধিদোষে কর্মহানি, উন্নতিতে বাধা। অলসতার কারণে উন্নতিতে বাধা। নিকট আত্মীয় হতে লাভ। ব্যবসা থেকে উন্নতি। ছোটোখাটো ভ্রমণ হতে পারে। সন্তানের ব্যাপারে মনোকষ্ট। লটারি বা ফাটকায় লাভ।

মীন : কথার্বাতার কারণে আর্থিক উন্নতি। শিক্ষাক্ষেত্রে মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। সন্তানের ব্যাপারে অশান্তি। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ, মামলায় সাফল্য লাভ। নৈতিক অধঃপতনের কারণে সাংসারিক ও বৈষয়িক ক্ষতি। কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তির দ্বারা লাভবান হতে পারেন। দূর ভ্রমণে সমস্যা আসতে পারে।

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ২২।।

ডা: হেডগেওয়ার অনেকদিন থেকেই এমন একজনের খোঁজ করছিলেন, যিনি তাঁর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সঙ্ঘের কাজ করবেন। এইসময় তাঁর কাছে একটি সংবাদপত্র বের করার প্রস্তাব এল।